1287

শ্রীকান্ত রায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

ও

প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ

মজুমদার লাইব্রেরী

২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৯০৬

মূল্য ৪৲ টাকা।

কলিকাতা,
শ্যামবাজার, ৭নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট্,
"কেশব প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে"
শ্রীশ্রীমন্ত রায় চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।

যাঁহার

মাতৃস্নেহ লাভ করিয়া

কৃতার্থ ও গৌরবযুক্ত হইয়াছি,

সাহিত্যগুরু অমর বঙ্কিমচন্দ্রের

সেই

সাহিত্যানুরাগিণী, ধর্ম্মপরায়ণা, পরদুঃখকাতরা

দুহিতা

বঙ্গীয় মহিলাকুলের আদর্শকল্পা

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর

শ্রীচরণ কমলে

ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ

এই পুস্তকখানি

উৎসর্গ

করিলাম।

শ্রীকান্ত রায়।

THE KESHUB PRINTING WORKS.

ভূমিকা

বাঙ্গলার যাঁহারা গৌরব, স্বদেশের ধর্ম্ম, সাহিত্য সমাজ ও রাজনীতির ইতিহাসে যাঁহাদের নাম চিরকাল জাজ্বল্যমান থাকিবে, সেই সকল প্রাতঃ স্মরণীয় মহাপুরুষদিগের চরিত্রমূলক পুণ্য-কাহিনী বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য ও আদরণীয়। যাঁহাদের স্বর্গীয় প্রতিভার পুণ্যকিরণে ধর্ম্মজগতে উষার আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহাদের প্রতিভাবলে সমগ্র ভারতের মধ্যে কেবল একমাত্র বঙ্গেই সাহিত্য নামের যোগ্য অপূর্ব্ব সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাদের প্রভাবে আমাদের মৃতপ্রায় সমাজে জীবন সঞ্চারের লক্ষণ দেখা গিয়াছে, যাঁহাদের প্রতিভার প্রভাবে আসিন্ধু হিমাচল সমগ্র ভারত প্রভাবিত এবং অনুপ্রাণিত, সেই সকল মহাপুরুষের পবিত্র কাহিনী সংগ্রহ ও প্রচার করা সমাজ ও লোকশিক্ষার পক্ষে সর্ব্বথা কল্যাণকর। তাহাই একত্রিত ও সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার জন্য আমি অনেক দিন যাবৎ চেষ্টিত ছিলাম। কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব, শারীরিক অসুস্থতা, আমার অগ্রজ স্বনামখ্যাত স্বদেশ-উৎসর্গীকৃত জীবন রমাকান্ত রায়ের মৃত্যু ও আমার অযোগ্যতা ইত্যাদি নানা কারণে পুস্তকখানি ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিতে পারি নাই। এখন যাহা প্রকাশ করিলাম তাহাও অতি অসম্পূর্ণ। একজনের পক্ষে এরূপ গ্রন্থ সুচারুরূপে সম্পাদন করাও অসম্ভব। এই প্রকার পুস্তক প্রকাশের এই প্রথম উদ্যম, ইহা আরম্ভমাত্র, শেষ নহে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভরসা করি পাঠকগণ ইহার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ইচ্ছাসত্ত্বেও কয়েকজন মহাপুরুষের নাম ইহাতে সন্নিবেশিত করিতে পারি নাই। ভবিষ্যতে এই ভ্রম সংশোধন করিতে যত্ন পাইব। এই গ্রন্থখানি সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্য শিক্ষিত বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহাদের উপদেশ ও উৎসাহে ভবিষ্যতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

বহুশ্রম ও অর্থব্যয়ে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। বঙ্গের অমর সন্তানগণের মহৎ চরিত্র স্মরণ করিয়া একটী বঙ্গসন্তানও যদি উন্নতি শিখরের এক পদ অগ্রসর হইতে পারেন, তবে অর্থ-ব্যয় ও শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

বহুখ্যাত নামা স্বদেশহিতৈষী, সুলেখক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই পুস্তক প্রকাশ করিতে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তন্মধ্যে দুইজন শ্রদ্ধেয় বন্ধুর নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। একজন আমার অগ্রজ-সদৃশ হিতৈষী, স্বনামখ্যাত, সদাশয়, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুযোগ্য দৌহিত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। তাঁহারই উপদেশ এবং উৎসাহে আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি। অপর আমার সুখ দুঃখে সহায় অকৃত্রিম হিতৈষী, সদাশয়, ও সুলেখক বঙ্গদর্শনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়। শৈলেশ বাবু নিঃস্বার্থ ভাবে আমাকে সাহায্য না করিলে আমি এই পুস্তক প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতাম না। সুতরাং "বঙ্গ গৌরব" প্রকাশে যদি কিছু গৌরব থাকে, তাহা শ্রদ্ধেয় সুরেশ বাবু ও শৈলেশ বাবুর। আর ত্রুটির অংশ সকলই আমার নিজের। ইতি—

শ্রীকান্ত রায়,

প্রকাশক।

সূচী।


G. N. M.

স্বর্গীয় হাজি মহম্মদ মসিন।

হাজি সাহেব ১৭৩২ খৃঃ অব্দে হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালে তিনি পিতার সঙ্গে গোলাহাটে অবস্থিতি করেন, এই স্থানে তিনি আরবী ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন, কোরাণ সরিফে তাঁহার অসামান্য অধিকার প্রসিদ্ধ মৌলভিদিগেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। সচরাচর পণ্ডিতদিগের হাতের লেখা কদর্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু হাজিসাহেবের সুন্দর হস্তাক্ষর একটা দর্শনীয় সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি মুরশিদাবাদের নবাবের বাড়ীতে একটি উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হন, কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি সেই কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মক্কা ও মদিনা তীর্থ দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া স্বদেশ ছাড়িয়া যান। উক্ত তীর্থদ্বয় পরিদর্শন পূর্ব্বক তিনি নাজফ্ নামক স্থান দেখিতে যাত্রা করেন, এই সময় নাজফ্ এশিয়াতে আরবী ও ফারসী বিদ্যার কেন্দ্রস্থল স্বরূপ ছিল। এই স্থানে যাইবার সময় তিনি দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন, দস্যুরা তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। ঘোর বিদেশে তিনি কপর্দ্দকশূন্য, বান্ধবহীন অবস্থায় যে কি কষ্ট পাইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করা কঠিন। এই অবস্থায় প্রগাঢ় ধর্ম্মবিশ্বাস এবং প্রবল জ্ঞানার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছিল; তিনি ২৭ বৎসরকাল ভিক্ষালব্ধ অর্থের দ্বারা এসিয়ার নানাদেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি যে অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালী জাতির গৌরবের বিষয়; তাঁহার ন্যায় আরবী পারসীতে ব্যুৎপত্তি তৎকালে ভারতবর্ষে আর কাহারও ছিল কিনা সন্দেহ। তিন বৎসর পর্য্যটনের পর তিনি খোরাসান হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন,—কোরাণের অর্থ লইয়া সে সময় কোন বিচার হইলে বিখ্যাত মৌলবীগণ তাঁহার কৃত ব্যাখ্যাই শিরোধার্য্য করিয়া লইতেন। ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি কয়েকমাস দিল্লী, কাশী এবং পাটনা প্রভৃতি স্থানে অতিবাহিত করেন, তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া লক্ষ্ণৌর নবাব আসফদ্দৌল্লা তাঁহাকে প্রভূত অর্থ দিবার অঙ্গীকার করিয়া লক্ষ্ণৌ নগরীতে বাস করিতে আমন্ত্রণ করেন। স্বদেশ বৎসল হাজি সাহেব এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল বাঙ্গালা দেশে যাপন করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। কয়েক বৎসর ঢাকায় থাকিয়া মুরশিদাবাদে আগমন করিয়া তথায় বাস করেন। তাঁহার সঙ্গতি বেশী কিছু ছিল না, কিন্তু তথাপি দরিদ্রের ভিড়ে তাঁহার গৃহদ্বার একরূপ অবরুদ্ধ হইয়া থাকিত; তিনি নিজে মোটা খাইতেন ও পরিতেন কিন্তু সেই সামান্য খাদ্যের অংশীদার স্বরূপ রাস্তার কাঙ্গাল কত যে জুটিত তাহার ইয়ত্তা নাই। সকল ব্যক্তিকে তিনি সাহায্য করিতে পারিতেন না, তাঁহার সেরূপ সঙ্গতি ছিল না, কিন্তু পরহিত ব্রতই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ছিল; তিনি অনেক গরীব ব্যক্তিকে স্বীয় হস্তে সমস্ত কোরাণ সারিফ নকল করিয়া দান করিয়াছেন; পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে তাঁহার হস্তলিপি অতি সুন্দর ছিল, বিশেষ তাঁহার ন্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও পুণ্যাত্মার লেখা বলিয়া সেই সকল কোরাণের পুঁথি বহু সহস্র টাকায় বিক্রয় হইত, এইরূপ

দানে যে কত গরীব উপকৃত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। কথিত আছে তিনি ৭২ খানি কোরাণ একভাবে বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি এক তিল সময়ও অপব্যয় করিতেন না, এই অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন ছাড়া তিনি জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অন্যবিধ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, দর্জ্জির কার্য্যে ও লৌহ কর্ম্মকারের কার্য্যে তিনি রীতিমত অর্থের অর্জ্জন করিতেন; তরবারী চালনায়ও তিনি বিশেষরূপ দক্ষ ছিলেন, তাঁহার সামান্য খাদ্য তিনি স্বহস্তে পাক করিয়া লইতেন। মুর্শিদাবাদের নবাব প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে সেই সামান্য গৃহে যাইতেন, অথচ ধনীর সংস্পর্শে আসা তিনি এতই ভয় করিতেন যে নিজে কোন দিন নবাব বাড়ীতে পদার্পণ করেন নাই; তথায় তিনি গেলে রাজার ন্যায় পূজা পাইতেন, কিন্তু বিষয় নিস্পৃহ সাধু হাজি সাহেব ধনবানের সম্মান লাভের জন্য লোলুপ ছিলেন না। বৃদ্ধ বয়সে হাজি সাহেব তাঁহার বৈমাত্রেয় ভগিনী মানাজান বেগমের বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন, তিনি এই সম্পত্তি সুশাসন করিয়া ইহার আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা আয়ের এই সমস্ত সম্পত্তি শিক্ষার উন্নতি কল্পে দান করিয়া যান। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন এই দানপত্র স্বাক্ষরিত হয়। হুগলী, ঢাকা, চাটগাঁ ও রাজসাহীর মাদ্রাসা কলেজগুলি মসিন ফণ্ডের অর্থে চলিতেছে। ইহা ছাড়া এই অর্থে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের সমগ্র মুসলমান ছাত্রগণ নানা প্রকার সাহায্য লাভ করিতেছে। বিচারপতি আমির আলী এই অর্থ সাহায্যে বিলাতে যাইয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। হুগলীর ইমাম বাড়ী হাজি সাহেবের অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি। হাজি সাহেব নিষ্ঠাবান 'মিয়া' ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাসে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা একেবারেই ছিল না, তাঁহার জমিদারীতে হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বী অনেক কর্ম্মচারী ছিল; কতকগুলি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পূর্ণ মৌলভী হিন্দু কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে তাঁহাকে বাধা দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন "আমার জমিদারীতে হিন্দু প্রজাই বেশী, হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী ও অল্প বেতনে তাঁহাদের দ্বারা ভাল কাজ পাওয়া যায়, আমি এ সম্বন্ধে আকবরের নীতিই উৎকৃষ্ট মনে করি", তিনি রাজস্ব বিভাগটি সমস্তই হিন্দু কর্ম্মচারীর হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।



স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়।

হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামমোহনের পিতা নবাবের সরকারে ইজারদার ছিলেন। রামমোহন রায় বাল্যকালে পাঠশালায় বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া, নবম বর্ষ বয়সে মৌলভির নিকট পার্শী ও আরবী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন; এই উদ্দেশ্যে তিনি তিন বৎসরকাল পাটনায় ছিলেন। তথা হইতে কাশীতে যাইয়া ৫ বৎসরকাল সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করেন; এই সঙ্গে তিনি বেদ ও উপনিষদের কোন কোন অংশ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সময়ে মুসলমান ধর্ম্মের একেশ্বরবাদ আলোচনায় সর্ব্ব প্রথম তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে মত-পরিবর্ত্তন হয়। ক্রমে বেদান্তে গাঢ় বুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, বেদান্তে ঈশ্বরের যে স্বরূপ নির্ণীত আছে, তাহাই হিন্দুর সার ধর্ম্ম এবং সেই প্রাচীন নির্ম্মল ধর্ম্ম ক্রমে পৌরাণিক দেবদেবী-কল্পনায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই বেদান্তোক্ত একেশ্বরবাদ প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ জন্মিল এবং পিতার সহিত এই বিষয়ে মতান্তর হওয়ায় তিনি গৃহত্যাগ পূর্ব্বক চারি বৎসরকাল তিব্বত প্রভৃতি নানাস্থানে পর্য্যটন করিলেন। তিব্বতে বাসকালে নানারূপ কষ্টে পড়িয়া তদ্দেশীয় রমণীগণের নিকট যে স্নেহ ও শুশ্রূষা পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে সেই অল্প বয়সেই নারীজাতির প্রতি গভীর সম্মানের ভাব চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে রামমোহনের পিতৃবিয়োগ হয়, এই সময়ে তিনি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে জজের সেরেস্তাদারী কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তখন তিনি ইংরেজী ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। রাজধানীতে একটি বৃহৎ বাড়ী ও উদ্যান ক্রয় করিয়া তথায় ধর্ম্মপ্রচারের জন্য রীতিমত সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এতদ্ব্যতীত একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া বিবিধপুস্তিকা-প্রচার দ্বারা পৌত্তলিকতার প্রতিকূলে এবং একেশ্বরবাদ সংস্থাপনের পক্ষে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। পাদ্রিদিগের সহিত এতদুপলক্ষে তাঁহার ঘোরতর কলহ বাধিয়া গেল। তাঁহাদিগের যুক্তি তর্ক নিরাস করিবার জন্য এবং বাইবেলের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইবার সংকল্পে রামমোহন হিব্রু ভাষা শিক্ষা করিলেন, এবং মূল বাইবেল স্বয়ং পাঠ করিয়া পাদ্রিদিগের সঙ্গে বিচার চালাইতে লাগিলেন। এ দিকে ভট্টাচার্য্যগণও নানাপ্রকার সঙ্গত ও অসঙ্গত উপায়ে তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করিতেও রামমোহন ক্রটী করেন নাই। তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত মূল আরবীতে লিখিত কোরাণ পাঠ করিয়াছিলেন, সুতরাং মুসলমান মৌলভিগণ তাঁহাকে কোনরূপ কূট তর্কে পরাজিত করিতে পারেন নাই। রামমোহন রায় বাঙ্গলা গদ্যে তাঁহার অনেক মতামত

প্রচার করিয়াছিলেন। তখন বাঙ্গলা গদ্য কোনরূপ গুরুতর বিষয় রচনার উপযোগী ছিল না। পার্শীমিশ্রিত একরূপ বাঙ্গলা চিঠিপত্র ও সরকারী দলিলে ব্যবহৃত হইত, তাহা সৎ সাহিত্যের কোনরূপেই উপযোগী ছিল না। রামমোহন রায় যে ক্ষুদ্র বাঙ্গলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে পরিদৃষ্ট হয়, বাঙ্গলা ভাষার অন্তর্নিহিত সূত্রগুলি তিনি যে ভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সেরূপ আর কেহ করিতে পারেন নাই। যে বাঙ্গালা গদ্যে তখন শিশুবোধক রচনাও অসম্ভব ছিল, সেই ভাষায় তিনি বেদান্তের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা গদ্যে যে বেদান্ত গ্রন্থের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ উৎকৃষ্ট, সারগর্ভ, প্রখর ধীশক্তির পরিচায়ক বাঙ্গলা গ্রন্থ তৎকালে আর রচিত হয় নাই। এই পুস্তকের সূচনায় তিনি বাঙ্গালা গদ্যের গঠন ও অর্থনির্ণয়প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তক পাঠে দেখা যায়—তিনি তাঁহার নিন্দাকারী প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতদিগের বিদ্রূপ ও ঘৃণাব্যঞ্জক বাক্যাবলী পাঠ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইতেন না। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে তিনি সতীদাহ সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা রচনা করেন এবং এই প্রথা নিবারণের জন্য এরূপ আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন, যে প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় লর্ডবেণ্টিঙ্ক এই প্রথা উঠাইয়া দেন। ১৮৩০ খৃঃ অব্দে তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে একটি উপাসনালয় স্থাপিত হয়, ইহাই ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত। দিল্লীর সম্রাট নিজের কতকগুলি বৈষয়িক ব্যাপার রাজদ্বারে নিবেদন করিবার জন্য রামমোহনকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করিয়া বিলাতে প্রেরণ করেন। ১৮৩১ খৃঃ অব্দের ৮ই এপ্রিল রামমোহন বৃষ্টলে উপস্থিত হন। বিলাতের ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায় কর্তৃক তিনি বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন; এবং তথাকার শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিতগণের সহিত তিনি যে বিচার ও ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও অতুলনীয় বিচারশক্তি দেখিয়া, বিলাতের পণ্ডিতগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ আইরিষ কবি মূরের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। বিলাতের উচ্চ শ্রেণীর ধনী ও সম্মানিত ব্যক্তিগণ তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া শ্লাঘা বোধ করিতেন। ফ্রান্সের প্যারিস্‌নগরে সম্রাট লুই ফিলিপ কর্তৃক দুইবার নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার বেলা ২টা ২৫ মিনিটের সময়ে বৃষ্টলনগরীতে রামমোহনের দেহত্যাগ হয়। বর্ত্তমান যুগে রামমোহন রায়ের ন্যায় সর্ব্বোতোমুখী প্রতিভা লইয়া ভারতবর্ষে আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির সূত্রপাতই রাজা রামমোহন রায় করিয়া গিয়াছেন।



স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১৮২০ খৃঃ অব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বেলা ১২টার সময় মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী। ১৮২৯ খৃঃ অব্দের ১লা জুন ঈশ্বরচন্দ্র পাঠার্থী হইয়া কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৮৪১ খৃঃ অব্দে তথায় পাঠ শেষ করিয়া ২১ বৎসর বয়সে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় তিনি অধ্যবসায় সহকারে ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করেন এবং তাহাতে ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। তিনি শোভাবাজারের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বর্গীয় আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের নিকট ঠিক ছাত্রের ন্যায় সেক্ষপীয়র-রচিত সমস্ত নাটক, টীকা টিপ্পনি করিয়া, পাঠ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রায়ই প্রবন্ধ লিখিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যাপনা করিবার সময়ে "বাসুদেব চরিত" নামক একখানি বাঙ্গলা পুস্তক রচনা করেন। অতঃপর তিনি ফোর্ট উইলিয়ামের কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন এবং সেই বৎসর রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার স্থলে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার "বেতাল পঞ্চ-বিংশতি" নামক পুস্তক রচিত হয়। এক বৎসরকাল সংস্কৃত কলেজে কার্য্য করিয়া তিনি উহা পরিত্যাগ করেন এবং ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড এসিষ্টাণ্টের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫০ খৃঃ অব্দে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং ১৮৫১ খৃঃ অব্দে উক্ত কলেজের প্রিন্সিপাল পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে তিনি হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া, এই কয়েক জেলার শিক্ষা-বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার হইয়াছিলেন। এই কার্য্য করিবার সময়ে ডিরেক্টার অব পাব্লিক ইনষ্ট্রক্‌সন মিঃ ইয়ঙ্গ গর্ডনের সহিত তাঁহার অনৈক্য উপস্থিত হয়; তিনি ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে কার্য্য পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে বঙ্গের তাৎকালিক ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাহাতে সম্মত হন নাই। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে কর্ম্ম করিবার সময়ে তিনি এই কলেজে ইংরেজী শিখাইবার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য নানাপ্রকার উন্নতি-সাধন করেন। যে সময়ে বাঙ্গলা ভাষা একদিকে ইংরেজী গদ্যের অনুকরণে দুরন্বয় ও অর্থজটিলতায় দুষ্ট হইয়া একটা উৎকট ভঙ্গিমা দেখাইতেছিল, এবং অপরদিকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণের বিপুলসমাস-কণ্টকিত ও বৃথাপাণ্ডিত্যের আড়ম্বরে বিড়ম্বিত হইতেছিল, সেই সময়ে বিদ্যাসাগর বাঙ্গলায় বিবিধ সদ্‌গ্রন্থ রচনাপূর্ব্বক সুসংবদ্ধ, ওজস্বিনী ও শ্রুতিমধুর ভাষার প্রতিষ্ঠা করিয়া, বাঙ্গলা ভাষার গতি নিয়মিত এবং উন্নতির পথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তৎপ্রণীত শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ ভাষার

বিশুদ্ধি ও অর্থের প্রাঞ্জলতায় এখনও আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে। বিদ্যাসাগর-প্রণীত উপক্রমণিকা, ব্যাকরণকৌমুদী, ঋজুপাঠ প্রভৃতি পুস্তক সংস্কৃত শিক্ষার্থীর পন্থা কিরূপ সুগম করিয়া দিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নানা প্রকার দয়ার কথা না জানেন, এমন লোক বঙ্গদেশে বিরল। তিনি দরিদ্রের দুঃখের কথা শুনিলে নিজে বালকের ন্যায় অকাতরে কাঁদিতেন। হিন্দু বিধবার কষ্ট দেখিয়া এই উদারচেতা মহাজনের করুণ হৃদয় বিগলিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, এতদর্থে বহু অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়া ৪০। ৫০ হাজার টাকার ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোন উচ্চ লক্ষ্যের জন্য এরূপ নিষ্ঠা, এরূপ রাজোচিত দান,—স্বীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় ৫০০ শত টাকা মাহিয়ানার কর্ম্ম মুহূর্ত্তে পরিত্যাগ, শত শত দরিদ্র পরিবারের ভরণপোষণের ভারগ্রহণ এবং শিক্ষা-বিস্তারের উদ্যোগে এরূপ অক্লান্তকর্ম্মঠতা,—বিদ্যাসাগরের এই সকল মহৎ গুণের আলোচনা করিলে, স্বতই আমাদের মন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠে। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় মেট্রপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয় গৃহটি তিনি দেড়লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দাতব্য হিসাবে মাসিক নির্দ্দিষ্ট ব্যয় ১৫০০৲ টাকার অধিক ছিল; তৎপ্রণীত পুস্তকের আয় মাসিক ৩৫০০৲ টাকা হইতে ৪৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইত। এই সমস্ত অর্থই তিনি পরোপকার-ধর্ম্মে ব্যয় করিতেন। তিনি নিজে চটী জুতা পায়ে দিয়া, লংক্লথের থান পরিয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন; প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য তেজেই তিনি ব্রাহ্মণের বেশ ছাড়িতে পারেন নাই। যে দেশে ব্রাহ্মণগণের নিবৃত্তির শুভ্র নিদর্শন স্বরূপ অতি দরিদ্রের বেশও জগতে গৌরবান্বিত হইয়া আছে—সেই দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই দৈন্য চিরসমাদরের যোগ্য। মাইকেল তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "জগতে একটি ব্যক্তি আছেন, যাঁহার হৃদয়টি মাতৃহৃদয়ের ন্যায় কোমল এবং বুদ্ধি ঋষির ন্যায় নির্ম্মল,—তিনি বিদ্যাসাগর।" গবর্ণমেণ্ট ১৮৮০ খৃঃ অব্দে ইহাঁকে সি, আই, ই, উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু এই উপাধি তিনি কখনও ব্যবহার করেন নাই। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে জুলাই বিদ্যাসাগর মহাশয় সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন।



স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দমোহন বসু পূর্ব্ববঙ্গের একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন, এবং দশ জনের মধ্যে অন্যতমের স্থান অধিকার পূর্ব্বক ২০৲ টাকার একটি বৃত্তি লাভ করেন। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া 'এলে' ও পরে 'বি এ' পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেন। তৎপর গণিতে 'এম এ' পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থানে আসীন হইলেন। তাঁহাকে উপাধি দেওয়ার সময় ভাইস্ চ্যানসেলার বলিয়াছিলেন যে গণিতের প্রশ্নের তিনি যেরূপ উৎকৃষ্ট উত্তর দিয়াছেন, ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণ তদপেক্ষা প্রশংসনীয়ভাবে উত্তর দিতে পারেন না। আনন্দমোহন ইহার পরে "রায়চাঁদ" "প্রেমচাঁদ" বৃত্তি লইয়া ১৮৭০ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে গমন করিলেন। সেখানে চারি বৎসর থাকিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের "রেঙ্গলার" উপাধি লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। দেশে আসিয়া তিনি ভারতবর্ষের বিবিধ কল্যাণকর কার্য্যে এরূপ আন্তরিকতার সহিত যোগদান করেন, যে স্বীয় অবলম্বিত ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি হইতে থাকে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি ছাত্রসভার প্রতিষ্ঠা করেন, ইহাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় "ভারত সভা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে ইনি বন্ধু দুর্গামোহন দাসের সাহায্যে "বঙ্গমহিলা" বিদ্যালয় নামক একটী উচ্চ শ্রেণীর মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে ইহাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির স্থাপিত হয়। সিটি স্কুল স্থাপন কল্পেও ইহাঁর উদ্যোগ ও চেষ্টা সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য, এই বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণ-কল্পে ইনি বহু সহস্র টাকা নিজে ঋণদান করেন, অথচ অন্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া এই স্কুল তিনি ট্রাষ্টির হস্তে প্রদান করেন, ইহার উপস্বত্ব হইতে এক কড়িও নিজে গ্রহণ করেন নাই। আনন্দমোহন কয়েকবার মিউনিসিপালিটির কমিসনাররূপে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা সহরের উন্নতির জন্য নির্ভীকভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে ইনি কলিকাতার ফেলো নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে ইনি ছোটলাটের সভায় সদস্য এবং রিপন বাহাদুর প্রবর্ত্তিত শিক্ষা কমিসনের অন্যতম সভ্য পদে মনোনীত হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের সভাপতি হইয়া ইনি যে বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা বাগ্মিতা ও সারবত্তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থলীয় হইয়া রহিয়াছে। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ইনি ইংলণ্ডে ব্রাইটন নামক স্থানে যে বক্তৃতা করেন, সেই অপূর্ব্ব বক্তৃতা এখনও তদ্দেশবাসী অনেকের মনেআছে। ১৮৯১ খৃঃ অব্দে তিনি পুনরায় বিলাতে গিয়াছিলেন, সেখানে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া অনেকে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সুপ্রসিদ্ধ স্যারজন লাবকের বাড়ীতে পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বরদিগের একটা ভোজ হয়. তাহাতে একজন বিখ্যাত মেম্বর বলিয়াছিলেন যে আনন্দমোহন পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিলে, তাঁহার বাগ্মিতায় ইংলণ্ড চমৎকৃত হইত, ভারতহিতৈষী বাগ্মীবর ফসেট সাহেব বলিয়াছিলেন যে ভারতের

দুর্ভাগ্য যে আনন্দমোহনকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইতেছে নতুবা ইংলণ্ডে থাকিলে তিনি একদিন রাজমন্ত্রী হইতে পারিতেন। বিলাতে থাকিবার সময় তাঁহাকে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল,—তাহা ছাড়া যেরূপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়ে। তাঁহার অভ্যর্থনার্থ ১৮৯৮ খৃঃ অব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা টাউনহলে যে মহাসভা আহূত হইয়াছিল, তাহাতে বলিতে গিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার মতন হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণনাশের আশঙ্কায় সভা বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল। আনন্দমোহনের বাগ্মিতা, তাঁহার জ্বলন্ত স্বদেশ-ভক্তি, তাঁহার পাণ্ডিত্য, সর্ব্বোপরি তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্র ও বিনয় দৃষ্টান্তস্থলীয়। তাঁহার জননী এমনই বিনীতা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন, যে কখনও মুসলমান পীরের সমাধির সম্মুখে গাড়ীতে যাইতেন না, গাড়ী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক গলবস্ত্রে সমাধিক্ষেত্র প্রদর্শন করিয়া দূরে যাইয়া গাড়ীতে উঠিতেন, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "সাধুর আবার হিন্দু মুসলমান কি?" এই উদার ধর্ম্মভাব যে আনন্দমোহনের চরিত্রে বর্ত্তিয়াছিল তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অধুনা সাধারণ ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের তিনিই অন্যতম নেতা ছিলেন। জাতীয় ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে যে মহতী সভা আহূত হয়, আনন্দমোহন রুগ্নদেহে তথাকার সভাপতির কার্য্য করেন, জাতীয় আনন্দের সমারোহপূর্ণ উৎসবে রোগের শয্যায় পড়িয়া তিনি নিজকে সামলাইতে পারেন নাই, তাঁহার বক্তৃতা কিরূপ হৃদয়গ্রাহী ও চমৎকার হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। মৃত্যু ১৯০৬ ইং আগষ্ট মাসে আনন্দমোহন পরলোক গমন করেন।



স্বর্গীয় রাধাকান্ত দেব।

রাজা রাধাকান্ত দেবের পিতা রাজা গোপীমোহন দেব শোভাবাজারের সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র। রাধাকান্ত কলিকাতায় মিঃ কামিঙ্গের ইংলিশ এ্যাকাডেমিতে ইংরেজি শিক্ষা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মৌলভী ও পণ্ডিতগণের সাহায্যে পার্শী ও সংস্কৃত বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হন। সংস্কৃতশিক্ষার পুনঃসমাদর ও ইংরেজিশিক্ষার বিস্তার কল্পে ইনি আজীবন অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ইনি আধুনিক কালের হিন্দুগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্ত্রীশিক্ষার অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই শিক্ষা অন্তঃপুরের সীমায় নিবদ্ধ রাখাই ইঁহার অভিপ্রেত ছিল। মহাত্মা ডেভিড হেয়ার বঙ্গদেশে বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য যে সকল অনুষ্ঠান করেন, রাজা রাধাকান্ত দেব তৎসমস্তের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। দেশের লোকের বিদ্যালাভ ও জ্ঞানার্জ্জনের পথ মুক্ত করিবার জন্য রাধাকান্ত অনেক কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাধাকান্ত দেবের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি তাঁহার "শব্দকল্পদ্রুম"। এই সংস্কৃত মহাকোষ বিলাতে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ইউরোপের প্রায় সমস্ত পণ্ডিত-সভাই ইহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মহারাণী ভারতেশ্বরী একটি সুন্দর সুবর্ণময় ঘটিকাযন্ত্র রাধাকান্তকে উপহারদান করিয়াছিলেন। জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞান-বিস্তারে একব্রত হইয়াও, রাধাকান্ত রাজনীতিঘটিত দেশহিতে কখনও ঔদাসীন্য করিতেন না। সমস্ত রাজনীতি ঘটিত সমিতিতে রাধাকান্তই অধ্যক্ষতা করিতেন। স্বাধীনতা ও সাহসে তিনি অকুণ্ঠিত ছিলেন। রাধাকান্ত হিন্দুকলেজের অন্যতম ডিরেক্টরের পদে বরিত হইয়াছিলেন। ১৮১৮ খৃ. অব্দে স্কুল সোসাইটীর সম্পাদকের কার্য্য এবং ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও জাষ্টিস অব্ দি পিসের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে "রাজা বাহাদুর" উপাধি এবং খেলাত পাইয়াছিলেন; অব্যবহিত পরে কে, সি, এস, আই উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার সম্মানরক্ষায় গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ ক্রটি করেন নাই। সংস্কৃত ভাষার উন্নতিকল্পে ইহাঁর নানাপ্রকার অনুষ্ঠান স্মরণীয়। "শব্দকল্পদ্রুম" রচনা করিয়া ইনি যাবতীয় সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তির পক্ষে একটি অতি নিবিড় দুর্গম পন্থা সহজগম্য করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এই অভিধান দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণের যে প্রভূত উপকার করিয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দের ১৯শে এপ্রিল ইনি শ্রীবৃন্দাবনেদেহত্যাগ করেন। হিন্দুধর্ম্মে, হিন্দুশাস্ত্রে এবং প্রচলিত হিন্দুর আচার অনুষ্ঠানে রাজা রাধাকান্তের অটল ও প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। যে অনুষ্ঠানকে তিনি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ও সদাচার-বিগর্হিত বলিয়া মনে করিতেন, তিনি তাহাতে কখনই পোষকতা করিতে পারিতেন না। যে নূতন প্রথা পদ্ধতি তাঁহার বিচারে হিন্দুসমাজের অনিষ্টকর বলিয়া প্রতীত হইত, সে প্রথা পদ্ধতির প্রবর্ত্তন-পথে বাধা দিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইতেন। যাঁহারা ভিন্নদেশী ভিন্নধর্ম্মী রাজাকে আমাদের

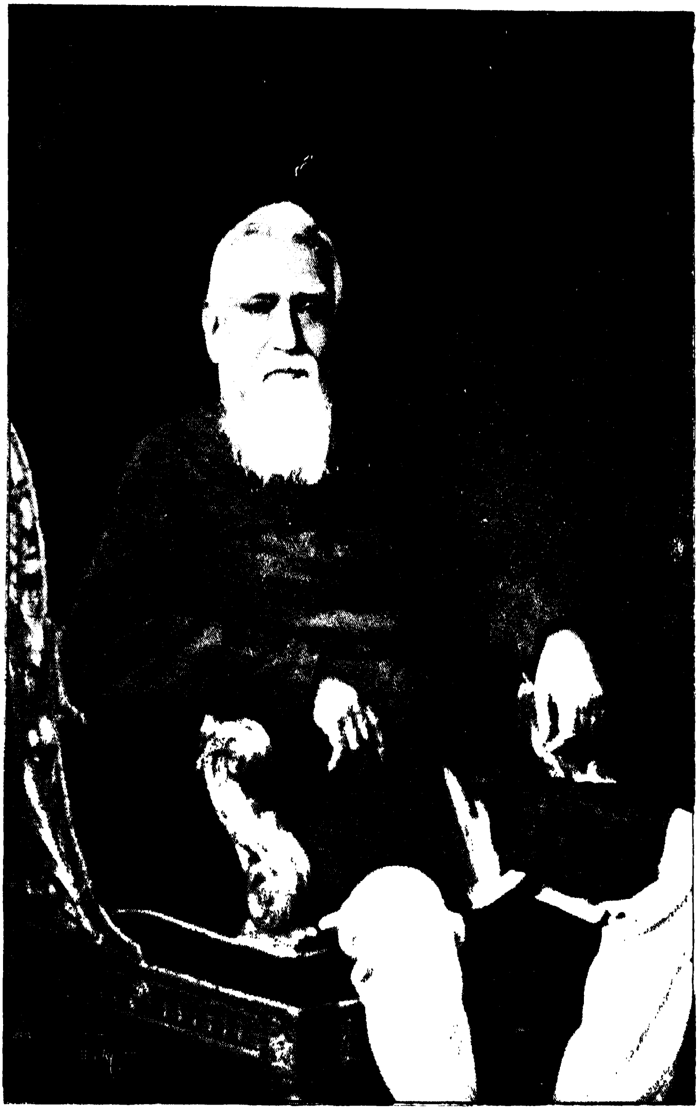
সামাজিক ও সাংসারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দিতে চাহেন, যাঁহারা আইনের সাহায্যে সমাজসংস্কার করাইতে ব্যস্ত, রাধাকান্ত তাঁহাদিগকে সমাজহিতৈষী বলিয়া মনে করিতেন না। এই জন্যই তিনি সহমরণ-নিষেধে ও বিধবাবিবাহে প্রতিবাদী হইয়াছিলেন।



স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর।

দ্বারকানাথ কান্যকুব্জাগত ভট্টনারায়ণের পুত্র নৃসিংহ কুশারীর বংশসম্ভূত। ইঁহারা বন্দ্যোপাধ্যায়; ব্রাহ্মণ বলিয়াই, "ঠাকুর" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। এখনও "ঠাকুর" বলিয়াই পরিচিত। দ্বারকানাথের উর্দ্ধতন চতুর্থপুরুষ জয়রাম আদিনিবাস যশোহর হইতে, বিত্তে বঞ্চিত হইয়া, কলিকাতার গোবিন্দপুরে বাস করেন। সেই অবধি ঠাকুর-বংশের কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা হয়। দ্বারকানাথের পিতামহেরা সাত সহোদর ছিলেন। তন্মধ্যে দর্পনারায়ণ ও নীলমণিই সুশিক্ষিত ছিলেন। এই নীলমণির পুত্র রামমণিই দ্বারকানাথের পিতা। দর্পনারায়ণ ও নীলমণির সময়েই যে, কলিকাতা নগরে ঠাকুর-বংশের প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তাহা "দর্পনারায়ণের লেনেই" প্রতিপন্ন হইতেছে। দ্বারকানাথের পিতামহ নীলমণি জজ আদালতের সেরেস্তাদারী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাঁহার পিতা রামমণির দ্বারকানাথ ব্যতীত আরও দুই পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে রমানাথ উত্তরকালে "মহারাজ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। ইনি প্রথমতঃ শেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে, তৎপরে রেভারেণ্ড মিঃ উইলিয়াম এড্যাম্‌সের নিকট শিক্ষালাভ করেন,—পৈতৃক জমিদারী পরিচালনায় ইনি অল্পবয়সেই সবিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। দ্বারকানাথ আইন-শিক্ষা করিয়া এতদ্দেশীয় রাজা মহারাজ ও ইংরেজ মহাজনগণের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন হন। ছয় বৎসরকাল ২৪ পরগণায় নিম্‌কির কালেক্টরের সেরেস্তাদারী-কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করায় কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে নিম্‌কির দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। ক্রমে তিনি বোর্ড, কষ্টম ও অহিফেন বিভাগের দেওয়ানী কর্ম্ম করেন। তৎপরে তিনি উইলিয়াম কার ও উইলিয়াম প্রিন্সেপ নামক দুইজন ইংরেজ অংশীদার লইয়া, "কার ঠাকুর" নামে, এক হাউস খুলেন। হাউসের প্রতিপত্তি শীঘ্রই বাড়িয়া উঠে। স্বাধীন সওদাগরী কার্য্যে দ্বারকানাথ বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। একজন দেশীয় লোকের এরূপ চেষ্টা দর্শনে প্রীত হইয়া লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ তৎপর "ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক" নামক এক ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই ব্যাঙ্ক সতর বৎসর পরে উঠিয়া যায়। দ্বারকানাথ দেশীয় সমস্ত হিতকর কার্য্যের অগ্রণী ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় ইঁহার পরম বন্ধু ছিলেন, তাঁহার প্রণোদনে দ্বারকানাথ সাধারণের উন্নতিকল্পে সমস্ত অনুষ্ঠানে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পরার্থপরতাও লোকহিতৈষিতার জন্য তিনি কলিকাতার "জষ্টিস অফ্ দি পীস" পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকৃলণ্ডকে শাসনবিধি সম্বন্ধে সৎপরামর্শ প্রদান করিবার জন্য লাটভবনে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। লর্ড অকৃলণ্ডও সহোদরা সমভিব্যাহারে সর্ব্বদাই দ্বারকানাথের ভবনে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতেন; দ্বারকানাথের বেলগাছিয়া উদ্যানে আসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ বিলাত-

যাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কলিকাতার প্রধান প্রধান সাহেবগণ একটি সভা আহ্বান করিয়া এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান পূর্ব্বক উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী তিনি প্রথম বিলাত যাত্রা করেন। তিনি রোমনগরে পোপকর্তৃক সম্মানিত হন; প্রুসিয়ার রাজকুমার ফ্রেডরিকের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া, তাৎকালিক বিজ্ঞানরাজ্যের অসাধারণ মনস্বিনী পণ্ডিতা মিসেস সমরভাইলের সৌহার্দ্দ লাভ করেন। লণ্ডনে যাওয়ার পর দ্বারকানাথ যেরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা অন্য কোন বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটে নাই। তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া বাকিংহাম প্রাসাদে অবস্থান করেন। তৎকালে মহারাণী নবমুদ্রিত, স্বনামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিয়া দ্বারকানাথের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। দ্বারকানাথ আরও কয়েকবার মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। তৎপর স্কটল্যাণ্ড ভ্রমণ করিয়া ১৮৪২ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। দ্বারকানাথের স্বহস্তলিখিত অনেকগুলি পত্র পাওয়া গিয়াছে; সেই সমস্ত পত্রে এবং দেশীয় ও বিদেশীয় বহু ভদ্রলোকের পত্রে অবগত হওয়া যায়, বন্ধুদিগের সাহায্যকল্পে তাঁহার হস্ত সর্ব্বদা উন্মুক্ত ছিল। দেশীয় সমস্ত সৎকার্য্যে তাঁহার আগ্রহ, সহানুভূতি এবং অর্থসাহায্য দেখিয়া সকলকেই বিস্মিত হইতে হইত। যাঁহারা "নব্যবঙ্গ" গঠন করিয়াছেন, দ্বারকানাথকে তাঁহাদের সংগঠক বলিয়া অভিহিত করা যায়। তিনি ডাক্তার সূর্য্যকুমার বা গুডিভ চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার ভোলানাথ বসু প্রভৃতি কয়েক জন শিক্ষার্থী যুবককে অধ্যয়নার্থ বিলাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে আবার বিলাত যাত্রা করেন। এবার তাঁহাকে আর স্বদেশে ফিরিতে হইল না। ১৮৪৬ অব্দের ১লা আগষ্ট তাঁহার বিলাতেই মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ এদেশে পৌঁছিলে সার পিটার গ্রাণ্টের সভাপতিত্বে টাউনহলে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর একটি মহতী শোক-সভার অধিবেশন হইয়াছিল।



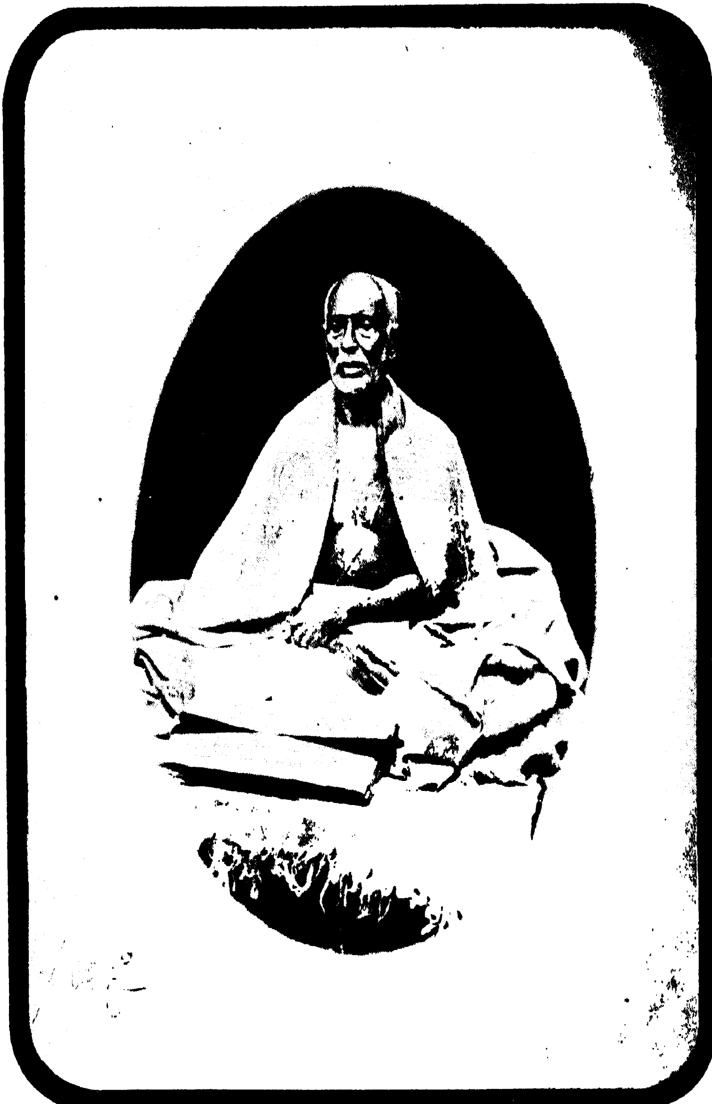
স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর সোমবার রামতনু লাহিড়ী কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম বর্ষ বয়সে ইনি দেবী চৌধুরী নামক এক ব্যক্তির পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ করেন। ত্রয়োদশ এই বৎসর বয়ঃক্রমকালে হেয়ার সাহেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "স্কুল সোসাইটি"র স্কুলে প্রবিষ্ট হন। স্কুল এখন হেয়ার স্কুল নামে পরিচিত। ১৮২৫ খৃঃ অব্দে ইনি হিন্দুকলেজে পাঠ করিতে অভিলাষী হন। সেই সময় হেয়ার সাহেবের অনুরোধে স্কুল-সোসাইটি ইহাঁকে ৫৲ টাকার একটি মাসিক বৃত্তি প্রদান করেন। রামতনু লাহিড়ী ডিরোজিয়োর ছাত্র;—তাঁহার সমপাঠিগণের মধ্যে অনেকের নামই এখন সুপরিচিত। রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, রাজা দিগম্বর মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ রামতনুর সহাধ্যায়ী ছিলেন। ইঁহারা সকলেই রামতনুর চরিত্রের প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। হিন্দুকলেজ হইতে শেষপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, রামতনু উক্ত বিদ্যালয়েরই অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। পরে তিনি বর্দ্ধমান, বারাশত, উত্তরপাড়া, বরিশাল, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানের সরকারী বিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরগ্রহণান্তে কতক সময়ের জন্য কৃষ্ণনগরে অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি নানারূপ শোকে সন্তপ্ত হইয়া কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে তাঁহার নিজের ও তাঁহার পরিবারবর্গের অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "গৃহে অগ্নি লাগিলে মানুষ যেমন সে গৃহ হইতে ছুটিয়া পলায়, কোথায় দাঁড়াইবে তাহা জানে না, তেমনি তাঁহারা যেন কৃষ্ণনগর হইতে ছুটিয়া আসিলেন।" তিনি কলিকাতায় আসিয়া হ্যারিশন রোডে বাস করিতে লাগিলেন। ১৮৯৮ সালের প্রারম্ভে খট্টা হইতে পতিত হইয়া তাঁহার একটি পদ ভগ্ন হয়, ঐ বৎসরের ১৩ই আগষ্ট রামতনু তনুত্যাগ করিয়া অনন্ত ধামে গমন করেন। রামতনু লাহিড়ীর জীবন-কাহিনীতে কোন আড়ম্বরপূর্ণ ঘটনা নাই। কিন্তু তাঁহার জীবনের পবিত্রতা, ধর্ম্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা ও চরিত্রের নির্ম্মলতা তাৎকালিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা অপূর্ব্ব; দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার সুরধুনী কাব্যে এই মহোদয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

> "এক দিন তাঁর সনে করিলে যাপন।
> দশ দিন থাকে ভাল দুর্ব্বিনীত মন॥"

বস্তুতঃ বৃথা শিক্ষাভিমান ও অবিনীত স্বেচ্ছাচারিতার যুগে রামতনু যে বিনয় ও দৈন্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বৈষ্ণব মহাজনগণের যোগ্য। কিন্তু ধর্ম্মমত সম্বন্ধে তিনি দৃঢ় ও অকুতোভয় ছিলেন। সাংসারিক শোক দুঃখ তাঁহাকে কিছুমাত্রও দুর্ব্বল করিতে পারে নাই। দুর্ঘটনাগুলি তাঁহাকে ভগবদ্ভক্তিতে সুদৃঢ় করিয়াছিল মাত্র। তাঁহার প্রাপ্তবয়স্ক

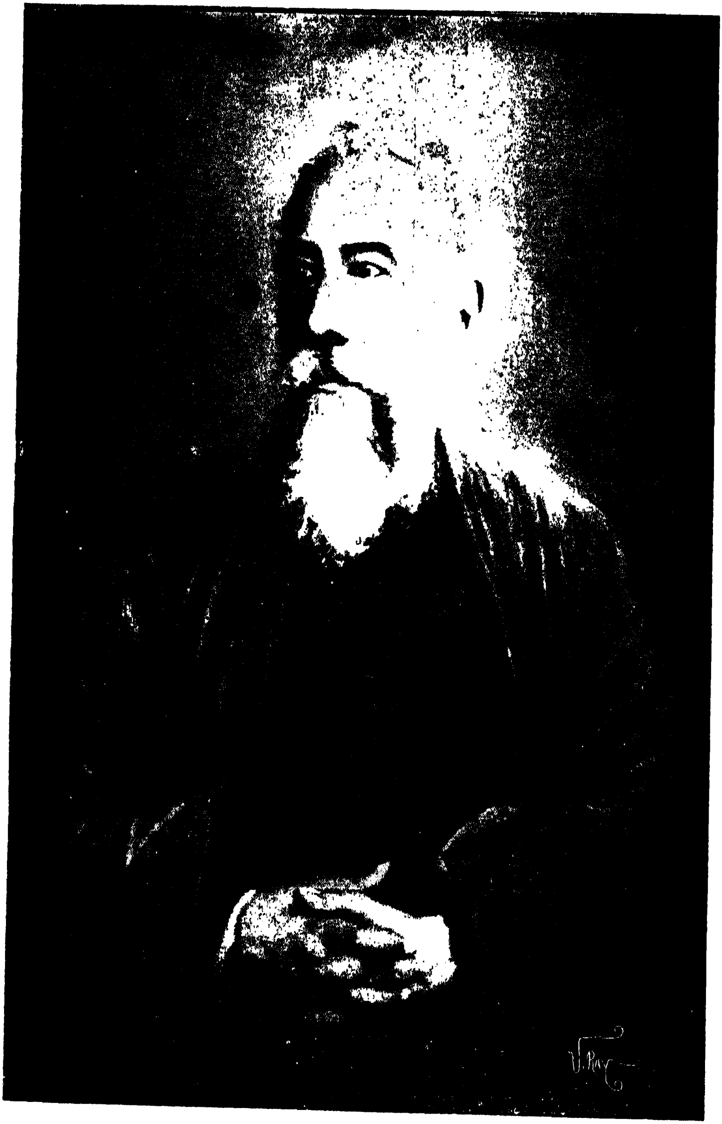
পুত্র নবকুমারের যে দিন মৃত্যু হয়, সেই গৃহে সে দিন একটি সভা হওয়ার কথা পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট ছিল। যথাসময়ে সভ্যগণ উপস্থিত হইলে তিনি ধীর ভাবে তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"দেখ আজ এ বাড়ীতে সভার অধিবেশন হইবে না ; আমার ভুল হয়ে গিয়েছে, আগে সংবাদ পাঠান উচিত ছিল।" সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ধীর ভাবে বলিলেন,—"অল্পক্ষণ পূর্ব্বে নবকুমারের মৃত্যু হইয়াছে, তার মৃতদেহ ঐ ঘরে পড়ে আছে, তোমরা যেও না—দেখ্‌লে কষ্ট হবে।" বস্তুতঃ সংসারের নানা বিরুদ্ধ অবস্থার প্রতি একান্ত ভ্রূক্ষেপহীন, ধর্ম্মনিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, শান্তমূর্ত্তি বিশ্বপ্রেমিক রামতনুর যিনি একবার সাহচর্য্য লাভ করিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ না হইয়া যান নাই। পণ্ডিত মোক্ষমূলর তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"যখন তিনি অন্য কাহাকেও দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া প্রগাঢ় উপাসনায় ব্যাপৃত দেখিতেন, তখন তিনি তাঁহাকে সংসারে ধন্য বলিয়া মনে করিতেন, কারণ তিনি নিজের অপরাধ সম্বন্ধে এত আশঙ্কান্বিত ও অনুতপ্ত থাকিতেন, যে ভগবৎসকাশে প্রকৃত প্রার্থনার ভাবে কখনই দুই একটি কথা মাত্র জ্ঞাপন করিতে সাহসী হন নাই। একদা উদ্যানে একটি গোলাপ ফুল বিকশিত দেখিয়া তিনি ভক্তি ভাবে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। যখন তিনি ভগবানের স্তবপাঠ করিতেন, তখন তাঁহার মুখ স্বর্গীয় আলোকে যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। তাঁহার এক জন বন্ধু আমাদিগকে জানাইয়াছেন, যে রামতনু এক দিন প্রাতঃকালে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক শয্যা হইতে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া বাহিরে আনয়ন করেন এবং বলিতে থাকেন,—"যখন সমস্ত জগৎ ভগবানের অপূর্ব্ব মহিমামণ্ডিত হইয়া আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছে, সেই সময়ে শয্যায় পড়িয়া থাকা নিতান্ত লজ্জার বিষয়।" নিদ্রোত্থিত বন্ধুবরকে তিনি উদ্যানে লইয়া যাইয়া উদীয়মান সূর্য্যের প্রতি এবং আলোকবিমণ্ডিত তরুপল্লবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—তাহা বেদ হইতে নহে,—ওয়ার্ডসোয়ার্থ হইতে। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এজন্য প্রথম প্রথম তাঁহাকে সামাজিক নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার দেব-চরিত্র শেষ বয়সে তাঁহাকে হিন্দু ও ব্রাহ্ম উভয় সমাজের চক্ষেই শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া সার সি, সি, ষ্টিভেন্স বলিয়াছিলেন, "রামতনু যে যুগে সমাজ-সংস্কারব্রত গ্রহণ করেন, সে সময়ে সমাজসংস্কারকের পন্থা অতি দুর্গম ছিল, এবং মহৎ ত্যাগস্বীকারের জন্য প্রস্তুত হইতে না পারিলে, কেহ তাহাতে ব্রতী হইতেন না।" রামতনু এরূপ সত্যপ্রিয় ছিলেন যে, একদা একটি বালককে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে কোন পরিচারিকা তাহাকে সন্দেশ দিব বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিল। রামতনু সেই পরিচারিকাকে রাত্রিকালেই বাজারে পাঠাইয়া সন্দেশ আনান এবং বালক প্রথম হইতে মিথ্যার পাঠ যাহাতে শিক্ষা না করে, তজ্জন্য পরিচারিকাকে সাবধান করিয়া দেন।



স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে (২৫শে আষাঢ়) যশোহর জেলার মাগুরা গ্রামে গঙ্গাধর জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম বর্ষ বয়সে গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তীর নিকটে ইঁহার হাতেখড়ি হয়। পাঠশালার পাঠ শেষ হইলে, গঙ্গাধর নন্দকুমার সেনের নিকটে মুগ্ধবোধ পড়েন। অনন্তর যশোহরের বাকুইখালী-গ্রাম-নিবাসী রামরত্ন চূড়ামণির নিকট অভিধান, অলঙ্কার ও কাব্য পাঠ করেন। তৎপরে বৈদ্যবেলঘরিয়া নিবাসী রামকান্ত সেনের নিকট চরকাদি বৈদ্যকগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে ইঁহার বয়ঃক্রম প্রায় বিংশ বর্ষ। গঙ্গাধর অতি অল্প-বয়সে মুগ্ধবোধের যে টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া নাটোরের কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, গুম্ফহীন একটি কিশোরবয়স্ক টোলের ছাত্র ইহা প্রণয়ন করিতে পারেন! এই টীকা দেখিয়া সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ অধ্যাপক মহাশয়েরা তাঁহার ভাবী কৃতিত্বের বিষয়ে আশান্বিত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম একবিংশ মাত্র, তখন গঙ্গাধর প্রবীণ পণ্ডিতদিগকে শাস্ত্রীয় বাদানুবাদে পরাস্ত করিয়া, স্বকীয় প্রতিভার অসামান্যত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। মুগ্ধবোধের টীকা বিশ সহস্রের অধিক শ্লোকে সমাপ্ত হয়। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি চরকের "জল্পকল্পতরু" টীকা; ইহার শ্লোকসংখ্যা ৬০,০০০। এই টীকায় তাঁহার যশ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়ে। তিনি মুর্শিদাবাদে চিকিৎসাব্যবসায় আরম্ভ করেন; তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে লোকের এরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল যে, লোকে বলিত মুর্শিদাবাদে স্বয়ং ধন্বন্তরির আবির্ভাব হইয়াছে। মুগ্ধ-বোধ ও চরকের টীকা ব্যতীত তিনি তৈত্তিরীয় প্রভৃতি তিনখানি উপনিষদের ভাষ্য, শারীরিক-সূত্রব্যাখ্যা, ঈশগীতা ও ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যান, সাংখ্য, ন্যায়, পাতঞ্জল ও বৈশেষিক দর্শনের ভাষ্য, কৌমার ব্যাকরণের ব্যাখ্যা, গোভিলগৃহ্যসূত্রের ভাষ্য, অগ্নিপুরাণোক্ত আয়ু-র্ব্বেদের ভাষ্য, প্রাচ্য-প্রভা নামে অলঙ্কার গ্রন্থ, পাণিনীয় উদ্ধার নামে বৃত্তি, শাণ্ডিল্যসূত্র ব্যাখ্যা, মনুসংহিতার প্রমাদভঞ্জিনী নামে টীকা, পরাশর যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতার চূর্ণক, ত্রিকাণ্ড শব্দশাসন ও ত্রিসত্ত্ব ব্যাকরণ, কুসুমাঞ্জলির টীকা প্রভৃতি বহুসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন, তাঁহার রচিত "লোকালোকপুরুষীয়" "দুর্গবধ কাব্য" "শিখণ্ডীপ্রাদুর্ভাব" নামক আখ্যায়িকা, "হর্ষোদয়" নামক চিত্রকাব্য, চৈতন্যাষ্টক, গোবর্দ্ধনবর্ণন, রাধাকৃষ্ণবর্ণন প্রভৃতি বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থে তাঁহার কাব্যরসজ্ঞান প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনি বাঙ্গালাভাষায়ও কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে "বহুবিবাহ-রাহিত্য" "বিধবা-বিবাহ-প্রতিষেধ" প্রভৃতি সামাজিক প্রসঙ্গে লিখিত পুস্তকগুলি উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ বিগত শতাব্দীর মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ভারতবর্ষে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রখরপ্রতিভাপ্রভাসিত সুপ্রতিষ্ঠ মহাপণ্ডিত অবসরকালে চিত্তরঞ্জনার্থ ভাস্কর্য্য ও চিত্রবিদ্যার চর্চ্চা করিতেন। একবার তাঁহার বাড়ীর

প্রতিমানির্ম্মাতার অনুপস্থিতিতে তিনি স্বহস্তে যে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছিল। বৈদ্য গঙ্গাধর বৈদ্যজাতির উন্নতির জন্য সবিশেষ যত্নশীল ছিলেন। বাঙ্গালা দেশের কোন কোন বৈদ্য আজকাল আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট। গঙ্গাধর এই চেষ্টার প্রাক্সূচনা করিয়া যে পুস্তিকা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই অনেকাংশে এরূপ সংকল্পের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছে। গঙ্গাধরের ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ পাণ্ডিত্যের গুণে যশস্বী হইয়াছেন। তন্মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে গঙ্গাধর কবিরাজ পরলোকগমন করেন।



স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে অমাবস্যার দিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বালক দেবেন্দ্রনাথ অতুল ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে নানারূপ বিলাস-সম্ভারে পরিবৃত হইয়া পালিত হইয়াছিলেন। রামমোহনের বিলাত-যাত্রার পর তাঁহার ব্রাহ্মসভার দীপটি নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া জ্বলিতেছিল; ১২ বৎসর পর্য্যন্ত একমাত্র রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ অসামান্য একাগ্রতা সহকারে এই সভাটিকে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। এই সভায় শ্রীকৃষ্ণ-রামচন্দ্রাদিকে ঈশ্বরের পূর্ণ অবতার প্রতিপন্ন করিবার জন্য বক্তৃতা হইত, বেদপাঠকালে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের লোক শ্রোতৃস্বরূপেও তথায় উপস্থিত থাকিতে পাইতেন না। ব্রাহ্মসভার এই অবস্থান্তর সময়ে গূঢ়দৈববিধানবলে এবং ঘটনাবশে যুবক দেবেন্দ্রনাথ ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ শৈশবে দেবদেবীর ভক্ত ছিলেন;—তিনি প্রত্যহ সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া হিন্দুকলেজে যাইতেন। কিন্তু সহসা এক দিন অনন্ত আকাশ দেখিয়া তাঁহার সমস্ত ভাবের বিপর্য্যয় হইয়া গেল। তিনি লিখিয়াছেন, "শুভক্ষণে যখন এই অনন্ত আকাশের উপর আমার নয়নযুগল নিক্ষিপ্ত হইল, তখনই আমার জ্ঞান উন্মীলিত হইয়া মনের পৌত্তলিক ভাবকে ক্ষণকালের মধ্যে তিরোহিত করিয়া দিল।" দেবেন্দ্রনাথ কাহারও কাছে ধর্ম্মশিক্ষা করেন নাই। সহসা অবস্থাচক্রে তাঁহার মনের অন্তর্নিহিত ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। আর এক দিন যখন তিনি পিতামহীর মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে গঙ্গাতীরে সামান্য চটের উপর বসিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার মনে অপূর্ব্ব বৈরাগ্য জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই বৈরাগ্যের উদয় হওয়ার পরে, তিনি স্বভাবতই তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া পড়িলেন। ব্রহ্মানন্দলাভের জন্য ব্যাকুলচিত্ত যখন উহারই সন্ধান করিতেছিল, তখন ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি তাঁহার হস্তগত হইল—সেই দিন তাঁহার জীবনসমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল,—বিলাসাচ্ছন্ন অজ্ঞানের অধ্যায় লুপ্ত ও জ্ঞানের অধ্যায় ব্যক্ত হইল। তাহার পরে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহার ব্যাখ্যা করা সহজ। কেন যে তিনি পৈতৃক ট্রাষ্ট-সম্পত্তি উত্তমর্ণদিগের জন্য ন্যস্ত করিয়া বিষয়ের মায়া-মোহ হইতে মুক্ত রহিলেন, কেন তিনি অম্লানবদনে সর্ব্বস্বে নির্লিপ্ত হইয়া, একাগ্রতার সহিত প্রত্যহ রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মালোচনা করিতে লাগিলেন, তাহা বুঝিতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না। উত্তমর্ণেরা যাহা আশা করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা অধিক যখন তিনি অযাচিত হইয়াও সহসা তাঁহাদের হাতে তুলিয়া দিলেন, তখন এই পুণ্যশ্লোক মহাজনের জীবন্ত ত্যাগের ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া, উত্তমর্ণদিগের মধ্যেই অনেকে কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেই সময়েই তিনি "যোগসাধননিরত মহর্ষি" নামের সম্যক্ অধিকারী হইয়া, সকলের প্রগাঢ় ভক্তিভাজন হইলেন। তিনি দশজন মাত্র সভ্য লইয়া প্রথমতঃ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে "তত্ত্ববোধিনী সভা" স্থাপন করেন। এই সভা হইতে "তত্ত্ব-

বোধিনী পত্রিকা'' প্রচারিত হয়। এই সভার নিয়ম ছিল যে, সভার অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে প্রবন্ধ যোগ্য বিবেচিত হইলে, উহা পত্রিকায় স্থান পাইবে। স্বয়ং মহর্ষি ও বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির লেখাও সভার বিচারাধীন হইত। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়া স্বয়ং অপরাপর ১৯ জন সভ্যের সঙ্গে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের পালনপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেন। অধুনা "আদি", "সাধারণ" ও "নববিধান" সমাজে উপনিষদের যে সকল শ্লোক ও মন্ত্রাদি উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহাদের সকলগুলিই দেবেন্দ্রনাথ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই সকল কার্য্যে তিনি অক্ষয়কুমার দত্তের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বাঙ্গালা রচনা উৎকৃষ্ট, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাঙ্গালাভাষা তাঁহার নিকট যে ঋণে আবদ্ধ, পরোক্ষভাবে তদপেক্ষা অনেক অধিক ঋণে আবদ্ধ—কারণ, তাঁহারই চেষ্টা, আনুকূল্য ও অনুপ্রাণনে যে বাঙ্গালা ভাষার অশেষরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে এবং তাহার দুই বৎসর পরে আরও তিনজন পণ্ডিতকে বেদবেদান্ত-শিক্ষার জন্য কাশীধামে প্রেরণ করেন। বেদ ও উপনিষদের প্রকৃত অর্থ জানিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে উৎকৃষ্ট ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিগৃহীত করিবার জন্যই তিনি ইঁহাদের সাহায্য লইয়াছিলেন। ডফ্ সাহেবের চেষ্টায় এ দেশে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অধিকতর প্রাবল্য হইতেছে দেখিয়া, দেবেন্দ্রনাথ প্রতিবিধানার্থী হইলেন, এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ মুক্ত করিবার জন্য "হিন্দু বেনেভোলেণ্ট স্কুল'' বা "হিন্দুহিতার্থি বিদ্যালয়ের'' প্রতিষ্ঠা করিলেন। স্বর্গীয় রাধাকান্ত দেবও দেবেন্দ্রনাথকে "জাতীয় ধর্ম্মের পরিরক্ষক'' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা বৈশাখ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রিয়শিষ্য কেশবচন্দ্র সেনকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি প্রদান করেন। কয়েক বৎসর কেশবচন্দ্রের সহযোগে ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্য উৎকৃষ্ট ভাবে চলিতে লাগিল। কিন্তু উপবীত-ত্যাগী না হইলে উপাচার্য্য পদে কেহ প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না, কেশব বাবু এই মত প্রচলন করিবার জন্য একটি দল প্রস্তুত করিলেন; অপরাপর কয়েকটি বিষয়েও মহর্ষির সঙ্গে তাঁহার মত-বিরোধ হইল। কাজেই আদিসমাজ হইতে ব্রহ্মানন্দ অবসৃত হইলেন। এই ঘটনায় মহর্ষি মর্ম্মপীড়িত হইলেও, কিছুতেই স্বীয় মত হইতে বিচ্যুত হন নাই। মহর্ষিদেব "আত্ম-তত্ত্ববিদ্যা" "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" "জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি" "পরলোক ও মুক্তি" "প্রবচন-সংগ্রহ" "স্তুতিমালা" "পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" "আত্মজীবন-চরিত" প্রভৃতি অনেকগুলি উপাদেয় পুস্তকের রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মাঘ ৮৮ বর্ষ বয়সে মহর্ষিদেব অনিত্য মর্ত্তধাম ছাড়িয়া সুখময় নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন; মুমুক্ষু মহর্ষির মুক্তিলাভ হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এই কয় পুত্রই ধর্ম্মে ও কর্ম্মে পিতৃপ্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতেছেন; জ্ঞানে পাণ্ডিত্যে এবং পুণ্যার্জ্জনে সকলেই শ্রেষ্ঠ, সকলেই দেশমান্য।



স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

যশোহরের অন্তর্গত সাগরদাঁড়ী গ্রাম—বাঙ্গালীর চক্ষে বিশেষ সমাদৃত; এই গ্রামে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি দিবসে, বঙ্গ-কবিকুল-শিরোমণি মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন। সাগরদাঁড়ীর প্রান্তে কপোতাক্ষ নদ প্রবাহিত; এই নদের তরঙ্গান্বিত মধুর প্রকৃতি মধুসূদনের স্মৃতির সঙ্গে চির বিজড়িত। তিনি তাঁহার সমাধি-প্রস্তরের জন্য লিখিত ক্ষুদ্র কবিতাটিতেও কপোতাক্ষের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল ছিলেন এবং যথেষ্ট অর্থ ও ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বাল্যকালে মধুসূদন হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করেন;—তখন ডিরোজিয়ো এবং কাপ্তেন রিচার্ডসন এই কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। সেই সময়ের নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে ইঁহাদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। মধুসূদন অল্পবয়সেই ইংরেজীতে প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়া, ছাত্র-মণ্ডলীর মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করেন। হিন্দু কলেজ হইতে জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করিয়া, ইনি খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দে ইনি বিশপকলেজে প্রবিষ্ট হন। এই সময়ে তিনি গ্রীকভাষা শিক্ষা করেন এবং পরে ক্রমে ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণ, এবং ইটালিয়ান ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৪৬ হইতে ১৮৫৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মধুসূদন মাদ্রাজে বাস করেন,—স্বজনপরিত্যক্ত ও অর্থাভাবগ্রস্ত হইয়া এই সময় তিনি নিরতিশয় কষ্টে কালযাপন করেন। এই দুঃসময়েই তাঁহার পিতৃমাতৃবিয়োগ হয় এবং তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির জন্য তাঁহাকে বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ইহারই মধ্যে এক সময়ে তিনি "ক্যাপ্টিভলেডি" নামক এক খানি ইংরেজী কাব্য প্রণয়ন করেন,—এই কাব্য দ্বারা মাদ্রাজে তিনি সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়া, মধুসূদন কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কোর্টে কতক দিন কেরাণীর কার্য্য করেন; এই পদ হইতে তিনি ক্রমে "ইণ্টারপ্রেটার" বা দোভাষীর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। বেলগাছিয়াতে রাজা প্রতাপসিংহ এবং ঈশ্বরচন্দ্রসিংহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ের জন্য মধুসূদন রত্নাবলী নাটকের ইংরেজী অনুবাদ রচনা করেন। তাৎকালিক ছোটলাট বাহাদুর এবং হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ এই নাটকের অভিনয় দেখিয়া বিশেষ প্রীতিপ্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে কোন শুভগ্রহের প্রভাবে তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইংরেজী রচনায় যতই কেন প্রসিদ্ধি লাভ করুন না, মাতৃভাষার করুণায় বঞ্চিত হইলে কোন কবিই অমর জয়মাল্য ধারণের অধিকারী হন না। একটি চতুর্দ্দশ-পদী কবিতায় তিনি বঙ্গভাষা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা জানা যায়, তিনি এই ভাষাকে দীনহীনা মনে করিয়া ইহার দৈন্য ঘুচাইবার স্পর্দ্ধায় সেবাব্রত গ্রহণ করেন নাই; তিনি বুঝিয়াছিলেন এ ভাষা রত্নের খনি, তিনি মূঢ় এ জন্য এত দিন ইহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়া পরিতপ্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি বঙ্গভাষায়

মহাশক্তি আবিষ্কার করিয়া ইহাকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিলেন। মাইকেলের ন্যায় পাশ্চাত্য ভাষার পণ্ডিত-শিরোমণি যখন বঙ্গভাষার জয়নিশান হস্তে লইয়া দাঁড়াইলেন, তখন পাশ্চাত্য শিক্ষাস্পর্দ্ধিত নব্য সম্প্রদায় আর এ ভাষাকে হেয় বা উপেক্ষার্হ মনে করিতে পারিলেন না। বঙ্গভাষার উন্নতি সুনিশ্চিত হইয়া গেল। মাইকেল "শর্ম্মিষ্ঠা", "পদ্মাবতী" ও "কৃষ্ণকুমারী" নাটক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণকুমারীর আখ্যান ও কেন্দ্রবর্ত্তী ঘটনাচক্র অতি দক্ষতার সহিত সুসম্বদ্ধ। "একেই কি বলে সভ্যতা" এবং "বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ"—নামক দুই খানি প্রহসনে তাৎকালিক সমাজের কতকগুলি গুরুতর দোষের চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। "তিলোত্তমাসম্ভব" কাব্যে তিনি সর্ব্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিন্যাস ও প্রতিষ্ঠা করেন। এই কাব্যের ছন্দ ও শব্দ-গ্রন্থন সর্ব্বত্র সুচারুসম্বদ্ধ ও সুসঙ্গত হয় নাই। কিন্তু খরবেগ-শালিনী নদী যেরূপ বিশাল প্রস্তরখণ্ড অতিক্রম করিবার সময়ে কচিৎ আহত প্রতিহত হইয়া আবর্ত্ত-বিক্ষেপে স্বকীয় দুর্জ্জয়শক্তি প্রতিপন্ন করে, মিত্রাক্ষরের বাধানিষ্ক্রান্ত মাইকেলের ভাষাপ্রবাহ এই পুস্তকে সেইরূপ কচিৎ ভগ্ন হইয়াও তদ্রূপ প্রভূত শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছে। তাঁহার লিপিকুশলতার যে সকল ত্রুটি "তিলোত্তমাসম্ভব" কাব্যে দৃষ্ট হয়, "মেঘনাদবধে" তাহা বিরল। বঙ্গের কবিকুঞ্জ এ পর্য্যন্ত রমণীজনোচিত কমকণ্ঠে মুখরিত ছিল, কিন্তু মাইকেলের ওজস্বী কণ্ঠ পুরুষোচিত ও বিক্রান্ত। বঙ্গভাষার অন্তর্নিহিত যে একটা প্রবল শক্তি ছিল, তিনিই সর্ব্বপ্রথম তাহার আভাস দিয়াছেন। "মেঘনাদবধ-কাব্য" পাশ্চাত্য কাব্য-সমূহ হইতে সমাহৃত বিবিধ সৌষ্ঠবে সমৃদ্ধ। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেল ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় তিনি বারিষ্টার হইবার জন্য "গ্রের ইনে" আশ্রয় লন। দেশ হইতে রীতিমত টাকা প্রেরিত না হওয়াতে, অর্থাভাবনিবন্ধন ঋণজালে জড়িত হইয়া তিনি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি পারিস্ নগরীতে আসিয়া, কিয়ৎকাল বাস করেন। পারিস্ তাঁহার নিকট পার্থিব স্বর্গ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। বিদেশে যখন অর্থাভাবে বড় কষ্ট পাইতেছিলেন, তখন তিনি দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়-কৃত আর্থিক সাহায্যে সবিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাঁহার একটী সনেট বা চতুর্দ্দশপদী আছে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন ব্যারিষ্টার হইয়া এ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল অপরিণামদর্শী জীবনের শেষ সময়ে তাঁহাকে অর্থাভাব-জনিত কষ্টের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইতে হইয়াছিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন মাইকেল "ভুঞ্জি বহু দুঃখ সংসার-কারাতে"—একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের পুস্তকাগারে মাইকেলের স্বহস্তলিখিত "তিলোত্তমাসম্ভব" কাব্যের পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। সারকুলার রোডের সমাধি-স্থলে এক খানি ক্ষুদ্র প্রস্তরে মাইকেলের স্বরচিত সমাধি লিপি ক্ষোদিত রহিয়াছে। বঙ্গদেশের বিপুল ও অজস্র অর্থ সরকারপ্রবর্ত্তিত স্মৃতিরক্ষার অনুষ্ঠানে বৎসর বৎসর অপচিত হইতেছে; কিন্তু যাঁহাকে আধুনিক কবিগণের অগ্রণী বলিয়া আমরা মুখে ঘোষণা করি, তাঁহার স্মৃতি রক্ষার ব্যাপারে আমাদের একান্ত ঔদাসীন্য! ইহা কি বাঙ্গালীর কলঙ্ক নহে?



স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মহানগরীতে কৃষ্ণমোহনের জন্ম হয়। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহনের পিতা জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় একাদশবর্ষবয়স্ক কৃষ্ণমোহনকে হিন্দুকলেজে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করেন। কলেজে কৃষ্ণমোহন প্রথম হইতে উৎকৃষ্ট ছাত্ররূপে পরিগণিত হন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলে, কৃষ্ণমোহন বৃত্তি-লাভে সমর্থ হন। ঐ সময়েই দিল্লী কলেজের অধ্যক্ষ তাঁহাকে ৮০ টাকা বেতনে নিজের কলেজের শিক্ষক পদে নিযুক্ত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু কৃষ্ণমোহন দিল্লীযাত্রায় ইচ্ছুক না হওয়ায়, ১৮২৯ অব্দে তিনি পটোলডাঙ্গার "স্কুল সোসাইটির" স্কুলের শিক্ষকপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ডফ্ সাহেবের চেষ্টায় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর ইনি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে যুবক কৃষ্ণমোহন বিদ্যালাভে প্রাণপণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যবিদ্যার উচ্চ সোপানে অধিরূঢ় হইয়াও কিন্তু তিনি বাঙ্গালা ভাষার বিরাগী হন নাই। হিন্দুকলেজেই তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা চর্চ্চায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি "ইন্‌কোয়ারার" বা অনুসন্ধান নামক পত্রের প্রচার করিয়া, সেই পত্রে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিকূল আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৮৩১ অব্দে এই পত্রের সম্পাদকতা করিতে করিতে তিনি বিখ্যাত স্কচ্ পাদরি ডাক্তার ডফের নিকট খ্রীষ্টধর্ম্মের উপদেশ লইতে আরম্ভ করেন। কৃষ্ণমোহন প্রবীণ বয়সে দেশীয় সমাজের কল্যাণকর নানা অনুষ্ঠানে আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সদস্য হইয়া যেরূপ নির্ভীকভাবে আত্মমত প্রকাশ করিতে থাকেন, তাহাতেই কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি মহাচেতা হিন্দুগণ তাঁহার প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের মতামত-সমালোচনায়, রাজনীতি-চর্চ্চায় তাঁহার একান্ত অনুরাগ ও স্বাধীনভাব দেখিয়া কৃষ্ণদাস প্রভৃতি তাঁহাকে "শুক্লকেশ রাজনীতিক পাদ্রী" নামে সম্বোধন করিতেন এবং তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিতেন। ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত তাঁহার "এনসাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলেন্সিস" "বিদ্যাকল্পদ্রুম" তৎসময়ে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এই ক্রমশঃপ্রকাশ্য কল্পদ্রুমে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিদ্যায় কৃষ্ণমোহন নিজের পাণ্ডিত্য দেখাইয়া বিদ্যোৎসাহী সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সাতটি ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল। তাঁহার পাণ্ডিত্যে প্রীত হইয়া বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহাকে এলফিন্‌ষ্টোনের ভারতীয় ইতিহাস উপহার পাঠাইয়াছিলেন। হিন্দুর ষড়্‌দর্শন আলোচনায় তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি অনেক সংস্কৃত পুস্তকের যে সকল ইংরেজী টীকা প্রণয়ন করেন, তাহাতেও তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছিল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটি হইতে অনারেরি "ডক্টর অব্ ল" উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে সি, আই, ই, উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত করেন। ইনি সাধারণের হিতকর বহুকার্য্যে সংলিপ্ত ছিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সদস্যপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বেথুন সোসাইটি নাম্নী বিদ্বৎ-সভায়ও ইনি বহুকাল সহকারি সভাপতিরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি বহুকাল কলিকাতা মিউনিসিপালিটির স্বাধীনচেতা, কার্য্যতৎপর ও হিতসাধক সদস্যরূপে কার্য্য করিয়া আসিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যপ্রণালী ইঁহার অসহ্য হয়, তখন ক্ষুব্ধ মনে ইনি স্বীয় পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। শেষ বয়সে ইনি জ্ঞানচর্চ্চারই একান্ত অনুরাগী হইয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে ৭২ বৎসর বয়সে কৃষ্ণমোহন পরলোক গমন করেন। হিন্দু কলেজের যে সকল ছাত্র এতদ্দেশের মুখপত্রস্বরূপ হইয়াছিলেন, কৃষ্ণমোহন তাঁহাদের অন্যতম এবং প্রধানতম। ইংরেজি, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত—ত্রিবিধ বিদ্যার প্রচারে ইনি দেশের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন। ১৮৫০ অব্দে "সংবাদ-সুধাংশু" পত্রের সম্পাদকতা করিয়া, ইনি হিন্দু সম্পাদকদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। জননী জন্মভূমি ও মাতা বাঙ্গালা ভাষার ইনি অনেক হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার বিদ্যাকল্পদ্রুম বস্তুতই কল্পদ্রুমের ন্যায় ফল প্রদান করিয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণমোহন আজীবন বৃহস্পতি বলিয়াই পূজিত হইয়াছিলেন।



Kuntaline Press, Calcutta

স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি।

তারানাথ ১৮১২ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমান জেলার কালনা মহকুমায় কালনা সহরের অন্তঃপাতী অম্বিকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কালিদাস সার্ব্বভৌম প্রসিদ্ধ পণ্ডিতলোক ছিলেন। তিনি আধুনিকনিয়মানুসারে অকারাদিক্রমে একখানি সংস্কৃত অভিধান এবং "ঋণদান" নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণয়ন করেন। তারানাথের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন; পিতামহ রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত এবং প্রপিতামহ মুকুন্দরাম তর্কবাগীশ শাস্ত্রচর্চ্চায় অসামান্য প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়া অনেক ভূসম্পত্তির অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিয়া, পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহাঁরা "বাঙ্গাল ভট্টাচার্য্য" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তারানাথ অতি অল্প বয়সেই প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ব্যাকরণাদি-ঘটিত শব্দশাস্ত্রে প্রকৃতই অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন। জ্যোতিষ, ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রেও তাঁহাকে বঙ্গদেশের প্রায় কোন পণ্ডিতই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাঁহার পাঠানুরাগ এত প্রবল ছিল যে, তিনি অনেক সময়েই পুস্তক পড়িতে পড়িতে পথ অতিবাহিত করিতেন। পাছে এইরূপ তন্ময় অবস্থায় তিনি গাড়ী চাপা পড়েন, এজন্য বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সুহৃদ্‌বর্গ অনেক সময়ে চিন্তান্বিত হইতেন। তারানাথ কাশীতে যাইয়া হনুমান-ঘাটস্থ বিশ্বরূপ স্বামীর নিকটে বেদান্ত এবং পাণিনি পাঠ করেন; এবং বৃদ্ধ বয়সে যখন ঋণজালে আকণ্ঠ নিমজ্জমান হইয়াছিলেন, তখনও মাসিক ১৬৲ টাকা বেতন দিতে স্বীকার করিয়া জনৈক বেদবিৎ হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের নিকটে সামবেদ অধ্যয়ন করেন। তিনি কাশীর অনেক পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালি জাতি যে শাস্ত্র-জ্ঞানে সুপণ্ডিত, গর্ব্বের সহিত এই কথার প্রচার করিতে করিতে বহু প্রমাণ উপস্থিত করিতেন। তিনি সভাস্থলে উপনীত হইলে, অতি অল্প সংখ্যক পণ্ডিতই সাহস করিয়া তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারিতেন। তারানাথ হিন্দুস্থানী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা, এই তিন ভাষাতেই বিশুদ্ধতারক্ষা করিয়া এরূপ দ্রুত কথা কহিতে পারিতেন যে, এই তিনের কোন্‌টি তাঁহার মাতৃভাষা, তাহা বিদেশীয় লোকের পক্ষে নির্ণয় করা শক্ত হইত। ১৮৪৫ খৃঃঅব্দের ২৩শে জানুয়ারি তারানাথ সংস্কৃত কলেজে, ৯০ টাকা বেতনে, অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদে তাঁহার বেতন ক্রমে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তখন সংস্কৃত কলেজের কোন অধ্যাপকই ১৫০৲ টাকার অধিক বেতন পাইতেন না। তারানাথ ১৮৭৪ অব্দে পেন্‌সন লইয়া, ধর্ম্মে ও শাস্ত্রে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। প্রথম বয়সে তারানাথ অনেকগুলি ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ অম্বিকা গ্রামে একখানি কাপড়ের দোকান খুলিয়াছিলেন, এই ব্যবসায়ে পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতি হওয়াতেও তিনি দমিয়া যান নাই। তিনি কালনায় স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবসায় করিয়াছিলেন, বীরভূম জেলার সিউড়ীতে একখানি কাপড়ের দোকান প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় ধান্য ও ইক্ষুর চাষও আরম্ভ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ইংরেজি জানিতেন না। কিন্তু অদ্বিতীয় সংস্কৃত পণ্ডিত

হইয়াও, তিনি অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যেরূপ উদারতা ও পাশ্চাত্য সংস্কারের পরিচয় দিতেন, তাহা দেখিয়া, বড় বড় ইংরেজিবিৎ বিদ্বান্‌দিগকেও বিস্মিত এবং মুগ্ধ হইতে হইত। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি" এই নীতি-কথা তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই শ্রুত হইত। পণ্ডিত ব্রাহ্মণের পক্ষেও যে, ব্যবসায় বাণিজ্য নিষিদ্ধ নহে, সদাচাররক্ষাপূর্ব্বকও যে, ব্যবসায় বাণিজ্য করা চলে, তাহা তিনি প্রকৃত শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারাই প্রতিপন্ন করিতেন। বাণিজ্য ব্যবসায় ব্যতিরেকে বাঙ্গালী কোনকালে উন্নতি করিতে পারিবেন না, এই বিশ্বাস তর্কবাচস্পতির বিশুদ্ধ ও জ্ঞানালোকিত হৃদয়ে প্রবল ছিল। তিনি পরকে পথ দেখাইবার জন্য নিজে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন। প্রভূত ক্ষতি হইলেও, তিনি এ কর্ত্তব্য হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিতেন না। পাশ্চাত্য সাহস ও ব্যবসায়-বুদ্ধি তারানাথের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। সহিষ্ণুতা ধীরতায়ও তিনি অকুণ্ঠিত ছিলেন। ব্যবসায় উপলক্ষে লক্ষাধিক টাকা নষ্ট হইলেও তিনি হতবুদ্ধি বা হতাশ হন নাই। অর্দ্ধ লক্ষাধিক টাকার শাল, রুমাল কীটোদরে দিয়াও তিনি দিশাহারা হন নাই। তিনি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে তৃপ্ত হইতেন না, যখন যে ব্যবসায়ে হাত দিতেন, তাহাই বিস্তৃত মাত্রায় চালাইতেন। প্রথম বয়সে তিনি একবার কালনায় চাউলের কারবার করিয়াছিলেন। তাঁহার গোলায় ২০০ ঢেকী দিবারাত্র চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ঢেকীর শব্দে প্রতিবেশীদিগকে অস্থির হইতে হইয়াছিল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির গুণে তারানাথ সকল ব্যবসায়ের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। তাঁহার ন্যায় মণিরহস্যবিৎ বিরল। হীরা, পান্না প্রভৃতির দোষও তিনি দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিতেন। কর্ম্মচারী ও পরিচালকদিগকে অতিবিশ্বাস করিয়াই তিনি বঞ্চিত হইতেন ; কারবারেও এই জন্য তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত। তর্কবাচস্পতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ মতে সমর্থন করিয়া তর্কযুদ্ধে অনেক পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ নিষেধ প্রস্তাবে তিনি প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিবিধ এবং দুরূহ সংস্কৃত গ্রন্থের সংস্করণে ও ব্যাখ্যায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। ১৯২৬ সংবতে তর্কবাচস্পতি ধাতুরূপাদর্শের সংকলন করেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে সিদ্ধান্তকৌমুদীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সরলা নাম্নী টীকা রচনা করিয়া, তিনি সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মুদ্রারাক্ষস, বেণীসংহার, কাদম্বরী, রত্নাবলী, মালবিকাগ্নিমিত্র, মহাবীর চরিত প্রভৃতি কাব্য নাটকের ইহাঁর রচিত টীকা এখনও বিখ্যাত। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে তারানাথ রাজপ্রশস্তি রচনা করেন। তৎপরে 'তুলাদান পদ্ধতি' ও 'গয়া-শ্রাদ্ধাদি-পদ্ধতি' নামক অপর দুইখানি পুস্তক সংস্কৃতে রচনা করেন। বাচস্পত্যাভিধান রচনার পূর্ব্বে তারানাথ শব্দস্তোম-মহানিধি নামক অভিধানের সংকলন করেন। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম কীর্ত্তি 'বাচস্পত্যাভিধান' ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে সূচিত হয়। এই অসামান্য কার্য্যের জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগ হইতে অর্থসাহায্য পাইয়াছিলেন। এই পুস্তকের যশঃসৌরভ সমস্ত সভ্যজগতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ হইতেও সংস্কৃতাধ্যয়নের জন্য তাঁহার নিকট ছাত্রমণ্ডলী উপস্থিত হইত। ১৮৮৫ অব্দের ২৩শে জুন অপরাহ্ণ তিনটার সময় তারানাথ স্বর্গারোহণ করেন।



স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর, সি, এস, আই।

স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্ম-গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা গোপীনাথ ঠাকুর তৎকালে একজন শ্রেষ্ঠ দান-বীর বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। হিন্দু-কলেজ স্থাপন-সময়ে তিনি প্রচুর অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার প্রথমতঃ সেরবরণ সাহেবের বিদ্যালয়ে পাঠ করেন, এবং হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর তথায় কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া, পৈতৃক বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত হন। তাঁহার জমিদারীর আয় বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ছিল। কিন্তু কয়েকটি মোকদ্দমায় পরাজিত হইয়া, তিনি বুঝিলেন যে, ব্যবহারা-জীবগণ ধনিসন্তানদিগের নিকট হইতে, মামলা মোকদ্দমা উপলক্ষে, বহু অর্থগ্রহণ করিয়াও আশানুরূপ কার্য্য করেন না। এই জন্য বিপুল আয় সত্ত্বেও তিনি নিজের মোকদ্দমা নিজে চালাইবার সংকল্প করিয়া, আইন পাঠ করেন এবং সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল হন। ওকালতি ব্যবসায়ে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হয়। সদর আদালতের সরকারী উকীল মিঃ বেলী অবসর গ্রহণ করিলে, ইনি তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইতিপূর্ব্বে নীলের ব্যবসা, এবং তৈলের মিল চালাইয়া, তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ওকালতি ব্যবসায়ে, এরূপ প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন যে, তদ্দ্বারা পূর্ব্ব ক্ষতি সমস্ত পূরণ হয়, অধিকন্তু তাঁহার সম্পত্তিও যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। তিনি হিন্দু কলেজের পৃষ্ঠপোষক, ও অন্যতম পরিচালক ছিলেন। কলিকাতা ইউনিভারসিটি স্থাপিত হইলে, তিনি তাহার ফেলো নির্ব্বাচিত হন। এতদ্ব্যতীত তিনি মেয়ো হাসপাতালের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে মূলাযোড়ে সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করেন; পাঠার্থিগণের অবস্থানের জন্য এই বিদ্যালয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। প্রসন্নকুমার বিচারপতি সার বার্ণেস পিকক সাহেবের সহিত সম্মিলিত হইয়া, দণ্ডবিধি আইনের সংশোধন করিয়াছিলেন। হিন্দুর মৃতদেহ কলে দাহ করা না হয়, এজন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ প্রসন্নকুমার সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করাতে, তিনি প্রাচীন সমাজের প্রতি আস্থাবান হন এবং তাঁহার সমস্ত জমিদারীর স্বত্ব তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে প্রদান করেন। বড়লাট লর্ড ডালহাউসি ব্যবস্থাপক-সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, প্রসন্নকুমারকে তাহার সদস্য-পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার সি, এস্, আই, উপাধি প্রাপ্ত হন। লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে সতীদাহের নিবারণ জন্য রামমোহন রায় যে চেষ্টা করেন, তাহার প্রতিকূলে দেশীয় সমাজপতি ও পণ্ডিতগণ বিলাতে আবেদন প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমারের বিশেষ চেষ্টায় সেই আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছিল। প্রসন্নকুমার তাঁহার দরিদ্র প্রজাবর্গকে নানা প্রকারে সাহায্য করিতেন; তিনি বদান্যতার জন্যই বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মূলাযোড়ের সংস্কৃত কলেজে বহুসংখ্যক ছাত্রের জন্য তিনি বৃত্তি নির্দ্ধারিত

করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনুরাগ ও উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার জন্য, তিনি মন্বাদি প্রণীত স্মৃতি গ্রন্থের অনুবাদ, প্রচার ও বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় যুবকদিগকে ব্যবস্থা-শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার জন্য, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে তিন লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এই টাকার উপস্বত্বে প্রতিবৎসর একজন আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে হার্ব্বাট কাওয়েল সাহেব সর্ব্বপ্রথম আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুস্তকাগার একটি দেখিবার জিনিষ ছিল, সেই সময়ে কলিকাতায় এরূপ পুস্তকাগারের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল; ইহাতে বহুসংখ্যক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রসন্ন-কুমারের বিশেষ চেষ্টায় বৃটিশইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিনেট হাউসের দ্বারদেশে প্রসন্নকুমারের প্রস্তর-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভবানীপুরের একটি কুলীন ব্রাহ্মণের পুত্র। তাঁহার পিতার ৭টি স্ত্রী ছিলেন, ইহাঁদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভে হরিশ্চন্দ্র ১৮২৪ খৃঃ অব্দে ভবানীপুর জগুবাবুর বাজারের সন্নিহিত স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যাবস্থায় কয়েক বৎসর হরিশ্চন্দ্র "ইউনিয়ান স্কুল" নামক বিদ্যালয়ে পাঠ করেন; কিন্তু দারিদ্র্য বশতঃ অল্পকালের মধ্যেই পাঠ সাঙ্গ করিয়া বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। তিনি টলো এণ্ড কোম্পানির নিলামের আফিসে ১০৲ টাকা মাহিয়ানায় একটি কর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ইনি কর্ণেল চ্যাম্পেনির অধীনে কলিকাতার মিলিটারী অডিটার জেনেরেলের আফিসে ২৫৲ টাকা মাসিক মাহিয়ানায় কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হন। এই পদে অধিষ্ঠিত হইয়া, তিনি ক্রমে উন্নতি লাভ করেন; মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার বেতন ৪০০৲ টাকা হইয়াছিল। এই কার্য্য করিয়া তাঁহার প্রচুর অবসর থাকিত, অবসরকালের তিলমাত্রও তিনি নষ্ট করিতেন না; ইতিহাস, আইন এবং রাজনৈতিক গ্রন্থাদি পাঠে সময় অতিবাহিত করিতেন। এই সকল বিষয়ে বু্ৎপত্তিলাভ করিয়া তিনি শেষে সাহিত্যের বিশেষ চর্চ্চা করিয়াছিলেন। তিনি গিবনকৃত 'রোমান সাম্রাজ্যের উথান ও পতন' নামক গ্রন্থ ও অদ্বিতীয় জর্ম্মণ দার্শনিক 'কান্তের' দর্শন হইতে অনেকাংশ মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন; তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসামান্য ছিল। "হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার" নামক পত্রিকায় ইনি প্রথম প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে 'বেঙ্গল রেকর্ডার' পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইনি তাহাতে কতিপয় সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। অনন্তর ইনি সুপ্রসিদ্ধ "হিন্দু প্যাট্রিয়ট" পত্রিকার প্রচার করেন। এই পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা তাঁহার সময়ে ১৫০ জনের অধিক হয় নাই, সুতরাং ইহাতে তাঁহার আর্থিক ক্ষতিই হইয়াছিল। "হিন্দু প্যাট্রিয়ট" পরিচালনার জন্য হরিশ্চন্দ্রকে তাঁহার স্বীয় আয় হইতে মাসিক ১০০৲ টাকার অধিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইত। কয়েক বৎসর পরে হরিশ্চন্দ্র এই পত্রিকার স্বত্ব তাঁহার ভ্রাতা হারাণচন্দ্রকে প্রদান করেন। হিন্দুপ্যাট্রিয়ট হরিশ্চন্দ্র কর্ত্তৃক এরূপ দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের সহিত সম্পাদিত হইত যে, উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ সর্ব্বদাই এই পত্রিকার মতামত অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেন। ১৮৫১ খৃঃ অব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রথম স্থাপিত হয়; তৎপরবর্ত্তী বৎসরে হরিশ্চন্দ্র এই সভায় যোগ দান করেন এবং এই সভার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত ইহার আনুকূল্য করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন' তাঁহার প্রতি কি প্রকার অনুরাগী ছিলেন, তাহা একটি বিষয় হইতে জানা যায়;—নীলকর সাহেবেরা কুৎসা প্রচারের অভিযোগে দেওয়ানী আদালত হইতে ডিগ্রি পাইয়া হরিশ্চন্দ্রের ভবানীপুরের বাটী ক্রোক করেন; বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনই এই সময়ে অর্থ প্রদান করিয়া হরিশচন্দ্রের বাটী ডিক্রিদারের হস্ত হইতে মুক্ত করেন। সিপাহিবিদ্রোহের

সময়ে হরিশ্চন্দ্র নিজের হিন্দু প্যাটরিয়টে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। বাঙ্গালীরা যে এই বিদ্রোহের সহিত কোন প্রকারে সংস্পৃষ্ট ছিলেন না, তাহা এই সকল প্রবন্ধে অতি উৎকৃষ্ট ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছিল। এই বিদ্রোহের অবসানে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কিরূপ নীতি অবলম্বনীয়, এই সকল সারগর্ভ প্রবন্ধে হরিশ্চন্দ্র তাহারও আলোচনা করিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধ লর্ড ক্যানিংএর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই প্রবন্ধগুলি তাঁহাকে খ্যাতির চরমশিখরে আসীন করিয়াছিল। নীলকর সাহেবদের সহিত যখন দেশীয় প্রজাগণের কলহ হয়, তখন ইনি দেশীয় পক্ষ এরূপ অখণ্ডনীয় যুক্তি সহকারে সমর্থন করিয়াছিলেন যে, নীলকরগণ কিছুতেই তাঁহার যুক্তি তর্কের খণ্ডন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সপ্তাহে সপ্তাহে হিন্দু প্যাট্রিয়টে হরিশ্চন্দ্রের লেখনী-নিঃসৃত উৎপীড়নের করুণ-কাহিনী প্রকাশিত হইত; সেই চিত্রগুলি এরূপ জীবন্ত ছিল যে, নীলদর্পণের মতই তাহা বঙ্গীয় সমাজকে ক্ষোভ ও অন্যায় দমনের জ্বলন্ত ইচ্ছায় প্রণোদিত করিয়াছিল। নীলকর সাহেবগণ সমবেত হইয়া হরিশ্চন্দ্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন; এংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলি হরিশ্চন্দ্রকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র একাই এক শতের ন্যায় এই সময়ে নিপীড়িত প্রজাগণের জন্য অটলভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন; তাহাদের আবেদনপত্রগুলি তিনি নিজে লিখিয়া দিতেন, এবং স্বয়ং মোকদ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ পুনরায় বাহাল করিবার সময়ে পার্লিয়ামেণ্টে যে প্রসিদ্ধ আবেদন-পত্র প্রেরিত হয়, তাহা হরিশ্চন্দ্রেরই লেখনী-প্রসূত। ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার মত ব্রাহ্মসমাজের অনুকূল ছিল, ভবানীপুর ব্রাহ্মমন্দির প্রধানতঃ তাঁহার উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। জষ্টিস্ রমাপ্রসাদ রায়, জষ্টিস শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বন্ধুবর্গ হরিশ্চন্দ্রের অনুষ্ঠিত সর্ব্ব কার্য্যে সাহায্য করিতেন। মিঃ এফ, এইচ, স্ক্রীন সাহেব লিখিয়াছেন, "হরিশ্চন্দ্র যদিও অল্পকাল জীবিত ছিলেন, তথাপি তিনি বাঙ্গালা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তৎসাময়িক অন্য কোন ব্যক্তি তাহা করিতে পারেন নাই।" ১৮৬১ খৃঃ অব্দের ১৪ই জুন ৩৭ বৎসর বয়সে ক্ষয়কাশ রোগে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার এই কাল ব্যাধি উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার অকালমৃত্যুতে এতদ্দেশীয় আপামর সাধারণ সকলেই গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ১০৫০০৲ টাকা তদীয় স্মৃতি-রক্ষার জন্য সংগ্রহ করিয়া, তদ্দ্বারা হরিশ্চন্দ্রের বিধবা পত্নীকে আমরণ একটি মাসিক বৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি-রক্ষার্থ কালীঘাট রসারোডের পশ্চিমে, "হরিশচন্দ্র রোড" নামক একটি প্রশস্ত রাস্তা খোলা হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র অতি দুরবস্থা হইতে কেবল অক্লান্ত যত্ন ও অধ্যবসায়ে নিজে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়া, সাধারণের গভীর শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন।



স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে অর্থাৎ ১২২১ সালের আশ্বিন মাসে রামগোপাল ঘোষ কলিকাতা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ হুগলী জেলায় প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী-তীর্থের সন্নিহিত ও সংস্পৃষ্ট বাঘাটী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কলিকাতার চীনাবাজারে তাঁহার কাপড়ের দোকান ছিল। রামগোপাল শৈশবে হিন্দু-কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ইনি সুবিখ্যাত ডিরোজিও সাহেবের ছাত্র ছিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রামগোপাল ডেভিড হেয়ার্ সাহেবের সাহায্যে কলিকাতার কোন বণিকের কার্য্যালয়ে সহকারীর পদ লাভ করেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই ব্যবসায় সাহায্যে স্বীয় অবস্থার উন্নতিসাধন করেন। প্রথমতঃ একজন ইংরেজের অংশীদার-স্বরূপে কারবার চালাইয়া, পরে নিজেই "আর, জি, ঘোষ এণ্ড কোং" নামে কলিকাতায় এক কারবার খুলিলেন। এই কারবারের শাখা ব্রহ্মরাজ্যের আকায়েব ও রেঙ্গুন নগরে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই ব্যবসায় দ্বারা তিনি প্রভূত অর্থ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি দেশহিতকর নানারূপ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে "জ্ঞানান্বেষণ" নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়া, তাহার সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন এবং তৎপরে "উইক্‌লি স্পেক্টেটার" নামক একখানি ইংরেজী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া, বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্রের হস্তে তাহার সম্পাদনের ভার অর্পণ করেন। দেশের শিক্ষাবিস্তার পক্ষে ডেভিড্ হেয়ার প্রভৃতি সদাশয় লোকে যে অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, রামগোপাল তাহাতে প্রাণপণে পোষকতা করিয়াছিলেন। তিনি ডেভিড্ হেয়ারের দক্ষিণ হস্ত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি ছাত্রদিগকে পুরস্কার ও নানাপ্রকার অর্থসাহায্য দ্বারা উৎসাহিত করিতেন। এখানকার মেডিক্যাল কলেজে পাঠ সাঙ্গ করিয়া, যখন চারিটি ছাত্র বিলাতে গিয়া তাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে উদ্যত হন,—তখন বিলাত-যাত্রার জন্য যে প্রকার সামাজিক নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। পাছে এই সকল উৎপাতে বিলাতযাত্রীদের মন টলিয়া যায়, এই আশঙ্কায় রামগোপাল একরাত্রি ছাত্রদের সঙ্গে জাহাজে বাস করিয়া, তাহাদিগকে নানাপ্রকারে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। বেথুন-স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে, রামগোপাল স্বয়ং তাঁহার কন্যাকে তথায় ভর্ত্তি করিয়া দিয়া, স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন সাধারণের হিতকর কার্য্যে রামগোপাল অগ্রণী ছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যরূপে তিনি দেশীয় লোকের উন্নতিকল্পে আন্তরিক সহানুভূতিপ্রদর্শন ও সাহায্যদান করিয়া গিয়াছেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রধান পদে থাকিয়া, তিনিই যে, সভার সজীবতা ও উপযোগিতার বৃদ্ধি পক্ষে অগ্রণী হইয়াছিলেন, তাহা এখনও সর্ব্ববাদিসম্মত ও সর্ব্বজন-বিদিত। দেশীয়গণের সিভিল সার্ভিশে ও ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ পথ মুক্ত ও বিস্তৃত করিবার জন্য, তিনি অনেক উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছিলেন—তাঁহার অসামান্য বক্তৃতাপ্রভায় শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়া যাইত। তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে বিলাতের 'টাইমস্' পত্রিকা লিখিয়াছিলেন, "এই বক্তৃতা

বাগ্মিতার আদর্শস্বরূপ।" এই টাইম্‌সই রামগোপালকে "বঙ্গের ডিমস্থিনীশ" পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পার্লেমেণ্টের বিখ্যাত সভ্য উইলবারফোর্স কব্‌ডেন প্রভৃতির সহযোগী জর্জ টম্‌সন এ দেশে আসিয়া রামগোপালের গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রসিককৃষ্ণ, পিয়ারীচাঁদ প্রভৃতিকে লইয়া টম্‌সনের সাহায্যে, রামগোপাল যে সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাই পরে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে পরিণত হইয়াছিল। নিমতলার শ্মশানঘাট তুলিয়া দেওয়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রামগোপাল যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন,—ওজস্বিতা, সারবত্তা এবং উদ্দীপনা প্রভৃতি গুণে উহা অসামান্য শক্তির পরিচায়ক। চার্টারএক্ট, সার হেন্‌রী হার্ডিঞ্জের স্মৃতিচিহ্ন, লর্ড ক্যানিংএর শাসনপ্রণালী প্রভৃতিসম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতাগুলিও একান্ত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। সরকার বাহাদুর রামগোপাল ঘোষকে স্মলকজ কোর্টের দ্বিতীয় জজের পদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু রামগোপাল ধন্যবাদ পূর্ব্বক প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ১৮৬২ হইতে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রামগোপাল ছোটলাটের ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি কলিকাতা-ইউনিভার্সিটির ফেলো, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস-কমিটির সদস্য, (১৮৪৯ খৃঃ) লণ্ডন ও প্যারী-প্রদর্শনীর ভারতীয় শিল্পজাত-সংগ্রহিণী সমিতির সদস্য, চেম্বার্ অব্ কমার্শের সদস্য প্রভৃতি বিবিধ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, দেশের হিতকর নানা কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে রামগোপাল ঘোষ দেহত্যাগ করেন—তাঁহার সময়ে তাঁহার ন্যায় বাগ্মী ভারতবর্ষে কেহ ছিলেন না। যাঁহারা দেশের নেতা ছিলেন, ইনি তাঁহাদের প্রধানতম হইয়া দেশসেবায় জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। রামগোপালের ন্যায় স্বাধীনচেতা রাজভক্ত অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বড় লাট লর্ড ড্যাল্‌হৌসী যখন দেশীয় বিচারকদিগের দেওয়ানী ফৌজদারী অধিকার বিস্তৃত করিবার জন্য, তিনটী নূতন আইন বাহাল করেন, তখন এ দেশের ইউরোপীয় সমাজ একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৪৯ অব্দে এই জন্য বঙ্গ তুমুল বাদ প্রতিবাদে কম্পিত হইয়াছিল। দেশীয় লোকের শুভকর বলিয়া, এই তিনটী আইন, অত্রত্য বৃটিশ-সমাজে "ব্ল্যাক একৃট" বা "কৃষ্ণ-বিধান" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। আফরিকার কৃষ্ণ কাফরিদিগের দাসত্বমুক্তি বিষয়ক বিধানগুলি "কৃষ্ণবিধান" বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল; তাই কলিকাতার শ্বেতকায় বঙ্গ-শক্ররা, এ দেশের লোককে কাফরির দলে ফেলিবার জন্য, ড্যালহৌসীর তিন আইনকে "কৃষ্ণবিধান" বলিয়া পরিচিত করিতে চাহিয়াছিলেন। আইনত্রয়ে বাধা দিবার জন্য শ্বেত-সমাজ যাহা করেন নাই, এরূপ কাজ নাই। কিন্তু এক রামগোপালই প্রবল শ্বেত-সমাজকে যুক্তিবাণে জরজর করিয়া একেবারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ড্যালহৌসীর তিন আইনের পথও মুক্ত হইয়াছিল। মুন্সেফ, সব্ জজ ও ডেপুটী মাজিষ্টরদিগের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। এই আক্রোশে "এগ্রিহলটিকলচরাল" সোসাইটী বা উদ্ভিজ্জ সভার ইংরেজ সভ্যেরা ১৮৫০ অব্দের জানুয়ারি মাসে সভার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পদ হইতে, রামগোপালকে অবসৃত করেন। রামগোপালের ন্যায় স্বদেশভক্ত বিরল; তাঁহার ন্যায় মাতৃভক্তও একান্ত দুর্লভ।



Kuntaline Press, Calcutta.

স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল।

কৃষ্ণদাস ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কলিকাতার কাঁসারিপাড়া নামক পল্লীর এক প্রসিদ্ধ তিলিবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ স্বরূপচন্দ্র পাল ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রচুর ধনার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু সদ্ব্যয়ে একান্ত মুক্তহস্ত ছিলেন বলিয়া মৃত্যুকালে কিছুমাত্র সঙ্গতি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সুতরাং কৃষ্ণদাসের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র পালকে সামান্য সুতার ব্যবসায়ে কষ্টে সৃষ্টে পরিবারপালন করিতে হইত। কৃষ্ণদাস প্রথমে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে বিদ্যারম্ভ করিয়া, গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি নামক বিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ করেন। অনন্তর কিছুদিন এক পাদরি সাহেবের কাছে অল্পদিন ইংরেজি শিখিয়া, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে নূতন মেট্রপলিটান কলেজে প্রবেশলাভ করেন। তথায় সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক কাপ্তেন রিচার্ডসনের অধ্যাপনাগুণে ইংরেজি ভাষায় ও ইংরেজি সাহিত্যে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করেন। এই সময় হইতে ইনি কলিকাতা পব্লিক লাইব্রেরী নামক পুস্তকালয়ে বিবিধ সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিদ্যা ও জ্ঞানের বৃদ্ধি করেন। এই সময় হইতেই তিনি নানাবিধ মাসিক ও সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদাস ১৫০৲ টাকা বেতনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সহকারি-সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। এই কার্য্য তিনি এরূপ দক্ষতাসহকারে সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে কৃষ্ণদাস ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, আজীবন ৩৫০৲ টাকা মাসিক বেতনে সভার একরূপ অধ্যক্ষতাই করিয়া গিয়াছেন। "হিন্দুপেট্রিয়ট" পত্রিকা-সম্পাদনের জন্যই কৃষ্ণদাস পালের প্রতিষ্ঠা পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়াছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে, এই পত্রিকা স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের হাতে আসিয়া পড়ে। কিন্তু তিনি শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে হিন্দুপেট্রিয়ট প্রদান করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই কৃষ্ণদাস পালকে সম্পাদকত্বে ব্রতী করেন। অল্প সময়ের মধ্যে কৃষ্ণদাসই এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন এবং আজীবন এই পত্রিকার উন্নতিকল্পে অশেষ শ্রমস্বীকার করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল অনেক সময়ে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের যেরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল,—এখন এতদ্দেশের প্রায় কোন পত্র-সম্পাদকের প্রতি তাঁহাদের সেরূপ শ্রদ্ধা বা আস্থা দৃষ্ট হয় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, কৃষ্ণদাস কোন রাজপুরুষের প্রতি মন্দ অভিসন্ধির আরোপ না করিয়া, তৎকৃতকার্য্যের অতি ধীরভাবে আলোচনা করিতেন—তাঁহার লেখায় আদৌ বিরাগ বিদ্বেষের কোন চিহ্ন থাকিত না। এজন্য গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে প্রতিবাদ করিয়াও, তিনি রাজকর্ম্মচারীদের প্রীতি-পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। বরদারাজ্যের ভূতপূর্ব্ব রাজা মলহররাওর রাজ্যচ্যুতি উপলক্ষে, ইনি অতি ধীরভাবে বড় লাট লর্ড নর্থব্রুকের কার্য্যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। নর্থব্রুক যে কমিশনের হস্তে মলহররাওর বিচার-ভার দিয়াছিলেন, সেই কমিশনের রাজা ও

রাজমন্ত্রী প্রভৃতি দেশীয় সভ্যদিগের সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য না করিয়া, লর্ড নর্থব্রুক যখন বৃটিশ সভ্যদিগের অপসিদ্ধান্ত শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণদাস ধীরভাবে কিন্তু সময়োচিত তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ১৮৭৮ অব্দে যখন লর্ড লিটন বাঙ্গলা, হিন্দি প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নষ্ট করিবার জন্য, প্রেস-একৃট বাহাল করেন, তখন কৃষ্ণদাস অতি কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সার জর্জ্জ ক্যাম্বেলের প্রণীত একান্ত দূষিত স্বায়ত্তশাসনের পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইলে, ইনি তাহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। লর্ড নর্থব্রুক পাণ্ডুলিপি অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই বিনয় অথচ নির্ভীকতা, রাজ-ভক্তি অথচ স্বদেশের কল্যাণ মিশ্রিত থাকিত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইনি ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভায় এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় অভিষিক্ত হন। উভয় স্থলেই তিনি স্বীয় যোগ্যতা, স্বাধীনতা ও বাগ্মিতার বিশিষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদাস "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন এবং পরবর্ত্তী বৎসর সি, আই, ই উপাধিরূপ ভূষণে ভূষিত হন। কৃষ্ণদাস পালের স্বভাব বড় বিনয়মধুর ছিল, তিনি কখনই অধীরতা অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিতেন না। কৃষ্ণদাস ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই তারিখে বহুমূত্র রোগে প্রাণত্যাগ করেন। "পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।" যশে কৃষ্ণদাস অমর। পুত্র রাধাচরণ ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পুত্র পিতার নাম রাখিতেছেন।



স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

১৮২৪ খৃঃ অব্দের ১৫ই. ফেব্রুয়ারী কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ শুঁড়াপল্লীতে রাজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা জন্মেজয় মিত্র পারসী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। জন্মেজয়ের পিতামহ রাজা পীতাম্বর মিত্র অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন; তিনি মোগল সম্রাটের অনুগ্রহে বংশানুক্রমিক রাজা উপাধি, তিনশন অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কত্ব এবং দোয়াব পরগণার কোরা নামক স্থানে বিস্তৃত জমিদারী জায়গীর প্রাপ্ত হন। রাজেন্দ্রলাল কলিকাতার একটি সামান্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া ১৭৪০ সনে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৪১ সনে সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর ইহাঁকে বিলাতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের পিতা এই প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া ইহাঁকে মেডিকেল কলেজ হইতে ছাড়াইয়া লন। তখন রাজেন্দ্রলাল ওকালতী পরীক্ষার জন্য পড়িতে আরম্ভ করেন। যে বৎসর রাজেন্দ্রলাল ওকালতী পরীক্ষা দেন, সে বৎসরের পরীক্ষার সমস্ত কাগজ অপহৃত হয়, সুতরাং রাজেন্দ্রলালের কোনরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটে নাই। বিরক্ত হইয়া ইনি ওকালতীর চেষ্টাও ত্যাগ করেন। কিন্তু মেডিকেল কলেজের শিক্ষা ও আইনের অভিজ্ঞতা উত্তরকালে তাঁহার সর্ব্ববিধ জ্ঞানচর্চ্চায় বিশেষরূপে সহায়তা করিয়াছিল। ২২ বৎসর বয়সে ইনি এসিয়াটিক সোসাইটির এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন; এসিয়াটিক সোসাইটির বিস্তৃত পুস্তকাগারে ইনি ১৩ বৎসর কাল অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে অনেক ভাষা তাঁহার আয়ত্ত হয়; তিনি ইংরেজী, গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী, জর্ম্মণ, সংস্কৃত, পারসী, হিন্দী, উর্দ্দু ও উৎকল এই সকল ভাষায় তুল্যরূপ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, মাতৃভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ও অধিকার ছিল। আধুনিক সময়ের কোন বাঙ্গালিই তাঁহার মত পাণ্ডিত্য লাভ ও ইংরেজী রচনায় খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার "বুদ্ধগয়া" "উড়িষ্যার প্রাচীন তত্ত্ব," "ইন্দো এরিয়ন" প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব্ব রচনাকৌশলের উজ্জ্বল কীর্ত্তিস্তম্ভ। পাশ্চাত্য জগতের পণ্ডিতগণের নিকট এই সকল পুস্তক সবিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। তিনি ৫০ খানি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১৮৫১ খৃঃ অব্দে ইনি "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক বাঙ্গালা মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রে তাঁহার যে পাণ্ডিত্য পরিদৃষ্ট হয়, তাহা গৌরবজনক। "বিবিধার্থ সংগ্রহের" পরে "রহস্য সন্দর্ভ" নামক আর একখানি পত্রিকা রাজেন্দ্রলালের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাখানি পাঁচ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, ভূগোল-বিজ্ঞানাদি সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, এক সময়ে বঙ্গের সমস্ত বিদ্যালয়ে তাহার একাধিপত্য ছিল। কৃষ্ণমোহন ও রাজেন্দ্রলালই বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বে, বঙ্গীয় সাহিত্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অপ্রাপ্তবয়স্ক জমিদারবর্গের শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, রাজেন্দ্রলাল তাহার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। বর্ত্তমান বঙ্গীয় জমিদারবর্গের অনেকে

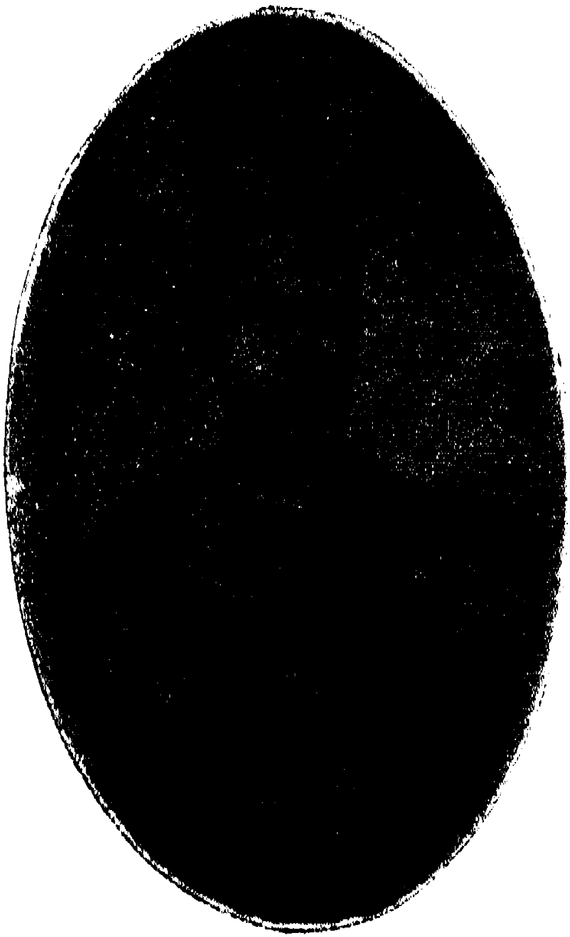
রাজা রাজেন্দ্রলালের শিষ্য। রাজেন্দ্রলাল কলিকাতা মিউনিসিপাল করপোরেশনের সদস্যস্বরূপে অনেক লোকহিতকর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে ইনি এসিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্টের পদে অভিষিক্ত হন। ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অভ্যুদয় হইতে রাজেন্দ্রলাল চিরজীবন এই সভার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গয়াছেন। ইনি কয়েক বৎসর এই সভার ভাইস প্রেসিডেন্ট ও শেষে প্রেসিডেন্টের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যের খ্যাতি পাশ্চাত্য জগতে এরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, বড় বড় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা ইহাঁর সহিত নানারূপ জটিল ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা করিবার জন্য চিঠিপত্র লিখিতেন; সেই সকল চিঠিপত্র হইতে জানা যায়, তাঁহার মতামত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বিশিষ্ট শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেন। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইহাঁকে "ডাক্তার অব ল" উপাধি প্রদান করিয়া ইহাঁর পাণ্ডিত্যের সম্মাননা করেন; ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে ইনি গভর্ণমেণ্ট হইতে "রায় বাহাদুর" উপাধি, ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে সি, আই, ই এবং তৎপরে "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত ইহাঁর সাহিত্যানুষ্ঠিত ও প্রত্নতত্ত্বসম্বন্ধীয় কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ গভর্ণমেণ্ট ইহাঁকে ৫০০৲ টাকার একটি মাসিক বৃত্তি প্রদান করেন। সেন্‌ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট স্বরূপ ইনি অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সহিত যে সকল হিতকর কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তজ্জন্য ইনি গভর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষরূপ ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন। ১৮৯১ সনের ২৬শে জুলাই ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রাণত্যাগ করেন। ইহাঁর মৃত্যু উপলক্ষে যাবতীয় প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইহাঁর শোকার্ত্ত পরিবারকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।



স্বর্গীয় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ হুগলী জেলার জাগুলিয়া গ্রামে হেমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ঐ গ্রামে মাতুলালয়ে থাকিয়াই তিনি নয় বৎসর পর্য্যন্ত পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন। হেমচন্দ্রের পিতার নাম কৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং হেমচন্দ্রই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ শেষ হইলে, হেমচন্দ্র স্বীয় মাতামহের সহিত, কলিকাতায় আগমন করেন এবং খিদিরপুরে থাকিয়া হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন; তিনি তথায় জুনিয়ার বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অনন্তর বর্ত্তমান নিয়মানুসারে এল, এ, বি, এ, পরীক্ষার রীতি প্রবর্ত্তিত হইলে, হেমচন্দ্র একই বৎসরে সিনিয়ার পরীক্ষা ও এল, এ, পরীক্ষা দিয়া, উভয়টিতেই যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। কিন্তু তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিয়া দুরবস্থা নিবন্ধন আর প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতে পারিলেন না। তিনি মিলিটারি অডিটার জেনারেলের আফিসে ৩০৲ টাকা বেতনের একটি কর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন; এবং সেখানে থাকিয়াই বি,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দিনকতক কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিয়া পরে কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলে ৫০৲ টাকা বেতনে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। তৎপর বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অস্থায়ীভাবে কতকদিনের জন্য শ্রীরামপুর, হাবড়া, প্রভৃতি স্থানে মুন্সেফী করেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তিনি কলিকাতার হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। ওকালতিকালে ক্রমশঃ তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও পসার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তিনি হাইকোর্টের উকিল-সরকার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, এক সময়ে তাঁহাকে হাইকোর্টের জজিয়তি দিবারও প্রস্তাব হইয়াছিল। শৈশবে হেমচন্দ্র রামায়ণ, মহাভারত ও ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী মনোযোগ ও অনুরাগ সহকারে পাঠ করিতেন—তদবধি তিনি বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রথমতঃ "চিন্তাতরঙ্গিণী" নামক কবিতাপুস্তক লইয়া তিনি সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হন; "বীরবাহু কাব্য" ইহার অব্যবহিত পরে রচিত হয়। কিন্তু "কবিতাবলীতেই" তাঁহার খ্যাতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে; অনন্তর "বৃত্রসংহার কাব্য" দ্বারা সেই যশ অদ্বিতীয় হইয়া উঠে। সুধী সমালোচকবৃন্দের মধ্যে অনেকে "বৃত্রসংহার" কাব্যকে মেঘনাদবধ কাব্য হইতেও উচ্চ আসন প্রদান করেন,—অন্ততঃ বিষয়ের গুরুত্ব রক্ষা ও চরিত্রগুলির যথাযথ চিত্রণে বৃত্রসংহারকাব্য যে, শেষোক্ত কাব্যকে পরাস্ত করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে বোধ হয় দুই মত হইবে না। হেমচন্দ্রের কল্পনা সুদূরপ্রসারিত, কিন্তু তাহা সংযত; চরিত্রগুলি কখনই গৌরবচ্যুত বা হীন হইয়া পড়ে নাই। অনেক স্থলে ক্ষুদ্র আভাসে কবিগুরু গম্ভীর রহস্যের অবতারণা করিয়া নাট্যশিল্পের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু মাইকেল অপেক্ষা তাঁহার কল্পনা প্রবল ও ধারণা-শক্তি বিরাট হইলেও তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের শব্দপটুত্ব ও ছন্দোবিন্যাসের ক্ষমতা আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। এজন্য বৃত্রসংহার তুষার-ভূষিত, প্রাকৃতিকদৃশ্যবিরল নিঃসঙ্গ

শৈল-শৃঙ্গের মত অবস্থিত থাকিয়া, দূর হইতে শুধু শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে। মাইকেলের কাব্য বারিধারার ন্যায় কলকাকলী করিয়া যে আনন্দ উৎপাদন করিয়া সাধারণের চিত্ত আর্দ্র ও প্রীত করিতেছে—সেই আনন্দদানের সৌভাগ্য বৃত্রসংহারকাব্য প্রাপ্ত হয় নাই। হেমচন্দ্রের গীতি-কবিতাগুলিতে মহাকাব্য-প্রণেতার যোগ্য একটা ওজস্বিতা আছে—তাহা ললিত-শব্দ-বহুল; কিন্তু তাহা পুষ্পস্তবকনম্রা ব্রততীর ন্যায় ভূলুণ্ঠিতা হইয় পড়ে নাই, স্বীয় পল্লবিত ও কুসুমিত সৌন্দর্য্য সত্বেও সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে। এই ওজস্বিতা ও তেজ অন্য কোন বঙ্গীয় কবির গীতি-কবিতায় এতটা পরিস্ফুট হইয়াছে, আমরা জানি না। বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হইয়া কবিবর কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হন। যে অজস্র অর্থ তিনি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা অজস্র ভাবে ব্যয়িত হইয়া নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। কর্ম্মশালা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, অন্ধ হেমচন্দ্র খিদিরপুরেরই একটি বাড়ীর এক কোণে পড়িয়া ছিলেন ;—পরপালক বদান্যবরকে শেষে পরপালিত হইতে হইয়াছিল। ভক্ত অনুরক্ত রাজা মহারাজ ও মহাশয়গণের প্রদত্ত অর্থের উপর তাঁহার মত লোককেও নির্ভর করিতে হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট মাসিক ২৫টী টাকার বৃত্তি দিয়া, অন্ধ কবিকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। অনন্তর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে অন্ধ কবির মৃত্যু হইল; তাঁহার সকল জ্বালা জুড়াইল। মৃত্যুর পর দেশের সমস্ত ভক্তি-প্রস্রবণ প্রবাহিত হইল; চারি দিকে সভাসমিতির আবাহন হইল, কৃতজ্ঞতাপ্রকাশও চারিদিকে শ্রুত হইতে লাগিল। তখন দেবী সরস্বতী লক্ষ্মীকে বলিলেন, "এই দেখ, তোমার নিগ্রহ ফুরাইয়া গেল, কিন্তু আমার অনুগ্রহ চিরস্থায়ী হইল।"



স্বর্গীয় দ্বারকানাথ মিত্র।

দ্বারকানাথ মিত্র ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে হাবড়া জেলার একটী বিখ্যাত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করেন। পঠদ্দশায় আট বৎসর বয়সে সরকারী নিম্ন ও উচ্চ শ্রেণীর বৃত্তিভোগ করেন। দ্বারকানাথ বাল্যকাল হইতেই মনস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি সমকালীন ছাত্রবৃন্দের মধ্যে সর্ব্বাংশে অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ও ইংরেজী সাহিত্যে অধিকার, উভয়ই অসামান্য ছিল। সহপাঠিগণ তাঁহার মেধা ও অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যে যেরূপ বিস্ময়প্রদর্শন করিতেন, উত্তরকালে অপূর্ব্ব যুক্তিশক্তি ও ব্যবহারশাস্ত্রঘটিত বিচিত্র সূক্ষ্মদর্শিতা দেখাইয়া হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিগণ ও ব্যবহারাজীবগণের হৃদয়েও তিনি সেইরূপ বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উত্তেজিত করিয়াছিলেন। কলেজে পড়িবার সময়ে তিনি যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার কোন কোনটি এখনও পুরাতন রিপোর্টে বিরাজমান থাকিয়া পাঠকের বিস্ময় উৎপন্ন করিতেছে। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের ৩রা মার্চ্চ তারিখের ইংলিশ-ম্যান পত্রিকায় তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত হইয়াছিল—"ইংরেজী ভাষায় দ্বারকানাথের অসামান্য অধিকার ছিল; তিনি যেরূপ বিশুদ্ধতা, প্রাঞ্জলতা ও ওজস্বিতা সহকারে এই ভাষা ব্যবহার করিতেন; ইংরেজী যাঁহাদের মাতৃভাষা, তাঁহাদের মধ্যেও সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। বিদেশীয় ভাষায় তাঁহার এই বিচিত্র অধিকার সর্ব্বশ্রেণীর শিক্ষিত লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিত।" ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি কতকটা স্বাধীন পথের পথিক ছিলেন। কিন্তু তিনি অদ্বিতীয় ফরাসি দার্শনিক ও প্রত্যক্ষবাদ ধর্ম্মপ্রচারক অগস্ত কোম্‌তের একান্ত ভক্ত হইয়াছিলেন; কোম্‌তের মূলগ্রন্থ পড়িবার জন্য তিনি ফরাসি ভাষায় অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। কোম্‌তের মত তাঁহার জীবনকে সবিশেষরূপে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি কোম্‌তের দর্শনের সহিত হিন্দু সমাজ ও হিন্দুধর্ম্মের একটা সামঞ্জস্য প্রতিপাদন করিয়াছিলেন;—তিনি য়ুরোপের কোম্‌তভক্ত প্রত্যক্ষবাদিগণের একান্ত অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিলেন। কোম্‌ত ধর্ম্মের প্রধানতম বৃটীশ ভক্ত ও প্রচারক কংগ্রীভের সহিত দ্বারকানাথের সর্ব্বদাই চিঠীপত্র চলিত। তাঁহার অকালমৃত্যু বিলাতের কোম্‌ত সম্প্রদায়ের গভীর পরিতাপের কারণ হইয়াছিল। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও ফরাসী ভাষায় বিলক্ষণ অধিকার ছিল; সেই জন্যই তিনি কোম্‌ত কৃত নূতন ক্ষেত্রতত্ত্বের ইংরেজী ভাষায় সুন্দর অনুবাদ করিতে পারিয়াছিলেন। এই পুস্তক বিলাতের প্রসিদ্ধ সমালোচকগণের কাছেও উচ্চ প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রথমে হুগলী কলেজে তৎপর প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠ সমাপন করিয়া ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে তিনি আইনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন। বিচারপতি রমাপ্রসাদ রায় এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিত অল্প সময়ের মধ্যে ইহাঁর গুণে মুগ্ধ হইয়া ইহাঁর একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। একদা রমাপ্রসাদ রায় কোন মোকদ্দমায় উকীল ছিলেন এবং দ্বারকানাথ তাঁহার সহকারী

ছিলেন; রমাপ্রসাদের অনুপস্থিতে দ্বারকানাথকেই সেই মোকদ্দমা চালাইতে হইয়াছিল। সেই মোকদ্দমার পরিচালনায় তিনি এরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই তাঁহার নাম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। ১৮৫৯ খৃঃ অব্দের দশ-আইন সংক্রান্ত এক প্রসিদ্ধ খাজনার মোকদ্দমা ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে হাইকোর্টের ১৫ জন বিচারপতি ফুল-বেঞ্চে বসিয়া বিচার করেন। এই মোকদ্দমায় দ্বারকানাথ প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া ক্রমাগত সাত দিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন; এই বক্তৃতায় তাঁহার আইনের প্রগাঢ় জ্ঞান, ব্যবহারনীতি ও ইতিহাসে অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য দেখিয়া ইংরাজ ও বাঙ্গালী সকলেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময়ে দ্বারকানাথ তাঁহার প্রতিপত্তির চরম সীমায় উপনীত হন। প্রধান বিচারপতি সার বার্ণেস পীকক এবং অপরাপর বিচারপতিগণ হিন্দু ও মুসলমান আইনে দ্বারকানাথের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাঁহার একান্ত গুণগ্রাহী হইয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতি মহাশয় অনেকবার প্রকাশ্যভাবে তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। একটি মোকদ্দমায় দ্বারকানাথ প্রিভিকাউন্সিলের নিষ্পত্তি কিরূপ হইবে, তাহাও পূর্ব্বে অনুমান করিয়া জানাইয়াছিলেন। হিন্দু-বিধবা ভ্রষ্টা হইলে স্বামীর সম্পত্তিতে তাহার অধিকার থাকিবে কি না, এই মোকদ্দমার বিচারকালে দ্বারকানাথ দুশ্চরিত্রা বিধবার বিরুদ্ধে যুক্তিগুলি অতি দক্ষতা সহকারে প্রদর্শন করিয়াছিলেন; জষ্টিস ফিয়ারও তাঁহারই মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ বিচারপতির মত অন্যরূপ হওয়াতে, দ্বারকানাথ এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সম্বন্ধে সফলতালাভ করিতে পারেন নাই। আদর্শপুত্র দ্বারকানাথ মাতৃভক্তি প্রদর্শনে অদ্বিতীয় ছিলেন; তাঁহার অর্জ্জিত বিপুল অর্থ সমস্তই তাঁহার মাতার অভিপ্রায়ানুসারে ব্যয়িত হইত। তিনি ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে, ৪০ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমকালে প্রাণত্যাগ করেন, হাইকোর্টের সমস্ত বিচারপতি একত্র হইয়া ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টকে লিখিয়া জানান,—দ্বারকানাথের ন্যায় অসামান্য পণ্ডিত ও প্রতিভাপূর্ণ বিচারপতির মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা শীঘ্র পূরণ হইবার নহে। তৎকালীন বড়লাট মহোদয় এই উপলক্ষে প্রকাশ্যভাবে শোক প্রকাশ করেন। দ্বারকানাথের ন্যায় বন্ধুপ্রিয় সরলচিত্ত লোক অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।



স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু।

রাজনারায়ণ বসুর পিতার নাম নন্দকৃষ্ণ বসু। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের একজন অকৃত্রিম সুহৃদ্ ও অনুগত শিষ্য ছিলেন। বসু বংশের নিবাস কলিকাতার অনতিদূরবর্ত্তী বোড়াল গ্রাম। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে রাজনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে গ্রামের পাঠশালায় বাঙ্গালা পড়িয়া, রাজনারায়ণ আট বৎসর বয়সে কলিকাতা হেয়ার স্কুলে প্রবেশ করেন। কথিত আছে, ইনি অধ্যয়নকালে এরূপ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যে, ইঁহার পরীক্ষাকালীন উত্তরের প্রশংসা বড় বড় ইংরেজী সংবাদপত্রে বাহির হইত। হেয়ার স্কুল হইতে রাজনারায়ণ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন এবং ইংরেজিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত কলেজ পরিত্যাগ করেন। এই সময় স্বনামধন্য অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজনারায়ণ তাঁহার সহকারী হইলেন। এই সময় হইতে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহিত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ হইলেন; আর অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত এমনি প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল যে, আমরণ উভয়ে উভয়ের সৌহার্দ্দ শ্লাঘনীয় মনে করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের বহুসংখ্যক পত্র রাজনারায়ণ বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বাবু সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন,—তাহাতে পরস্পরের প্রতি অনুরাগের যে পরিচয় আছে, তাহা যেন কতকটা অপার্থিব। ১৮৪৮ সালের মে মাস হইতে ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত রাজনারায়ণ হিন্দুকলেজের দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য করেন, তৎপরে মেদিনীপুর স্কুলের হেডমাষ্টারী পদ গ্রহণ করেন। তিনি মেদিনীপুরের ব্রহ্মসভায় যে সকল উপদেশ ও বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময়ে তিনি ইংরেজী ও বাঙ্গালায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর অঞ্চলে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য রাজনারায়ণ বিশেষরূপে যত্নপরায়ণ হইয়াছিলেন। নানারূপ পরিশ্রমে রাজনারায়ণ বাবুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, শিরঃপীড়ার জন্য তিনি ১৮৬৯ সালে কর্ম্মত্যাগ করিয়া, পেন্সন গ্রহণ করেন। তদবধি তিনি অধিকাংশ সময়ই দেওঘরে কাটাইতেন। ১৯০০ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর শনিবার রাজনারায়ণ বসু ৭৪ বৎসর বয়সে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার রচিত "সেকাল ও একাল" "বাঙ্গালাভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ" প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক বহুকাল তাঁহার কীর্ত্তিস্বরূপ বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। "সেকাল আর একাল" পুস্তকখানি একটি নিখুঁৎ চিত্র; তাহা বিদ্বেষবিহীন পরিহাসে উজ্জ্বল। কালে উহা বহুমূল্য ইতিহাসের সম্মান দাবী করিবে। রাজনারায়ণ বাবু অতি সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন, সামাজিক সভা সমিতিতে তাঁহার কথা শুনিবার জন্য বহুলোক উৎসুক হইতেন। তিনি এত বিষয়ের সংবাদ রাখিতেন ও স্বীয় কথিত বিষয় এরূপ পাণ্ডিত্য দ্বারা উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেন যে,

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "দুই দণ্ড কাছে বসিলেই মনে হইত লোকটি বিদ্যার জাহাজ।" ইহাঁর শিরঃপীড়ার সংবাদ পাইয়া ভুক্তভোগী অক্ষয়কুমার ইহাঁকে লিখিয়াছিলেন, "আপনি প্রাতঃস্নান করিবেন, কলের জল পান করিবেন, উষা ও সায়ংকালের বায়ু সেবন করিবেন, আর ঘটটিকে একটু চালনা করিবেন, আর নিজ হইতে কোনমতেই মাথা ঘোরাইবেন না।" রাজনারায়ণ বাবুর বন্ধুবাৎসল্য সম্বন্ধে তৎপুত্র যোগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"আমার পিতৃদেব অসাধারণ রূপে বন্ধুপরায়ণ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে যত লোকের সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছিল, প্রায় তাঁহাদের সকলকেই তিনি স্মরণ রাখিয়াছিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় পরলোকগত বন্ধুগণের একটি তালিকা করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাহা দেখিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেন। কলিকাতায় অবস্থিতিকালে একদিন শুনিলেন, একজন বন্ধু চল্লিশ বৎসর পরে কলিকাতায় আসিয়াছেন। অবিলম্বে তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন; পূর্ব্ব আলাপ পরিচয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন; কিন্তু সে লোকটির সে সকল কথা কিছুই স্মরণ হইল না; পিতৃদেব তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ক্ষুব্ধমনে চলিয়া আসিলেন।" খৃষ্টানদিগের সহিত রাজনারায়ণ বাবু বহুদিন তর্কযুদ্ধ চালাইয়াছিলেন।—"রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নোয়া এবং মোসেস্‌কে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া উল্লেখ করাতে রাজনারায়ণ বাবু পরিহাসের সহিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মনু ও যাজ্ঞবল্ককে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের তালিকা হইতে খারিজ করিয়া দিলেন কোন্ অপরাধে?" রাজনারায়ণ বাবু বালকের ন্যায় সরল ছিলেন; তাঁহার মত ধর্ম্মপরায়ণ আদর্শ পুরুষ বঙ্গদেশে বিরল।



স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

১৮২৫ খৃঃ অব্দের ২৫শে মার্চ্চ তারিখে, হুগলী জেলার খানাকুল থানার অধীন নাপ্তিপাড়া গ্রামে, ভূদেব মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ভূদেবের পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ পাণ্ডিত্যে ও চরিত্রগুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন; পাণ্ডিত্য, ও সদাচারশীলতার জন্য এই বংশের চিরকাল প্রতিষ্ঠা ছিল। আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে ভূদেব সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, এবং তিন বৎসর পরে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিয়া, তথায় সর্ব্বোচ্চ বিদ্যা ও পুরস্কার লাভ করিয়া যশস্বী হন। এই সময়ে ইংরেজিশিক্ষার নবপ্রভাবে অধিকাংশ শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক সমাজ-সংস্কার ব্যপদেশে উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার করিয়াছিলেন; ইংরেজিশিক্ষায় অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াও ভূদেব মুখোপাধ্যায় কিন্তু সর্ব্বতোভাবে সদাচার পালন করিয়াছিলেন। এই সদাচারনিষ্ঠতা ও সুশীলতা তাঁহাকে ইংরেজগণেরও শ্রদ্ধার পাত্র করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর সংবাদে ব্যথিত হইয়া, বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব সিবিলিয়ান-স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর হজ্‌সন প্রাট বলিয়াছিলেন, "আমি ভূদেবের সমুন্নত গৌরদেহ এখনও যেন আমার সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার শুভ্র পরিচ্ছদ ও সুন্দর মূর্ত্তি এখনও যেন আমার সম্মুখে বিরাজিত। ভূদেব সর্ব্বদাই গম্ভীর এবং সুচিন্তাপূর্ণ কথোপকথন করিতেন,—উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর এই চিন্তাশীলতাই বিশেষত্ব।" সার চার্লস্ ইলিয়ট, সার এল্‌ফ্রেড ক্রফ্‌ট্, সার রোপার লেথ্‌ব্রিজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ প্রকাশ্যভাবে ভূদেব সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য-প্রচার করিয়াছেন, তাহাও একান্ত শ্রদ্ধাব্যঞ্জক। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ভূদেব হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের হেড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৫২ খৃঃ অব্দে এ্যাসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টারের পদে এবং ১৮৬৩ অব্দে এডিশনাল ইন্‌স্পেক্টার-পদে অধিষ্ঠান করেন। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে ইনি পাঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের শিক্ষাসম্বন্ধে অনুসন্ধান ও কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ করিতে নিযুক্ত হন। গবর্ণমেণ্টও এতৎসম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যই কার্য্যে পরিণত করেন। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে ইনি শিক্ষাবিভাগের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হন এবং শেষে ১৫০০ টাকা বেতনে, ইন্‌স্পেক্টার-পদে কার্য্য শেষ করেন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে ভূদেব গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সি, আই, ই উপাধিরূপ সম্মান-ভূষণে ভূষিত হন। বিহার অঞ্চলের আদালত-সমূহে পার্শী অক্ষরের পরিবর্ত্তে নাগরীর প্রবর্ত্তন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে ইনি ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন এবং ১৮৮৩ খৃঃঅব্দে সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর কাশীধামে যাইয়া ইনি বেদান্ত অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে বেদান্ত-চর্চ্চার পুনরুদ্দীপনকল্পে চুঁচুড়ায় একটি চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দের ৬ই জানুয়ারী তিনি "বিশ্বনাথ-ফণ্ডে ১৬০০০০ টাকা দান করেন। তাঁহার পিতৃদেবের নামে ঐ চতুষ্পাঠীও "বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী" বলিয়া পরিচিত হয়। আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রমপূর্ব্বক সরকারী কর্ম্মে থাকিয়া এবং নানারূপ গ্রন্থ প্রচার করিয়া, ইনি মিতব্যয়িতা-গুণে যে অর্থের সঞ্চয় করিয়াছিলেন,

সন্তান বর্ত্তমান থাকা সত্বেও, তাহার অধিকাংশই জাতীয় শিক্ষার উন্নতিকল্পে প্রদান করিয়া, তিনি যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃত ব্রাহ্মণোচিত ও জগতের আদর্শস্থানীয়। বিশ্বনাথ ফণ্ডের অন্তর্গত কবিরাজী ও হোমিওপাথির দুইটী ডিস্পেন্সারী আছে;—তাহাতে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরিত হইয়া থাকে; কবিরাজ ও ডাক্তারের চিকিৎসায় প্রভূত পরোপকার সিদ্ধ হয়। বঙ্গ-সাহিত্যে ভূদেবের অনেক কীর্ত্তি বিদ্যমান। তৎরচিত শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব, ঐতিহাসিক উপন্যাস, প্রাকৃত বিজ্ঞান, বাঙ্গলার প্রাচীন ইতিহাস, পুষ্পাঞ্জলী, রোম ও গ্রীসের ইতিহাস প্রভৃতি অনেক পুস্তক সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁহার পারিবারিকপ্রবন্ধ, সামাজিকপ্রবন্ধ এবং আচারপ্রবন্ধ প্রভৃতি পুস্তকে যে গভীর চিন্তাশীলতা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে, বাঙ্গালীর কোন গ্রন্থে সেরূপ নাই। ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার চার্লস ইলিয়ট সামাজিক-প্রবন্ধ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"ভারতীয় আধুনিক কোন পুস্তকেই এরূপ গভীর দৃষ্টি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় নাই। প্রাচীন ব্রাহ্মণ হৃদয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মিশ্রণে যে অপূর্ব্ব ফল উৎপন্ন হইতে পারে—এই পুস্তক তাহার দৃষ্টান্ত স্থানীয়।" ভূদেব ১৮৯৬ খৃঃ অব্দের ১৬ই মে তারিখে ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমে ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি যশঃশরীরে অমর হইয়া আছেন।



স্বর্গীয় বিবেকানন্দ স্বামী।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কুলে বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। বিবেকানন্দস্বামী গুরুদত্ত নাম। ইঁহার প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতার জেনেরেল এসেম্ব্লি নামক কলেজ হইতে বি, এ, উপাধি লাভ করেন। কলেজে অধ্যয়ন কালেই সমবয়স্ক সহপাঠীরা ইঁহার বাগ্মীতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। ইনি কলেজে প্রায়ই সহপাঠীদিগকে লইয়া আলোচনা-সমিতি গঠন করিতেন এবং তথায় হৃদয়গ্রাহিণী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজেও মাঝে মাঝে উপস্থিত হইয়া তথাকার কার্য্যে উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। কিন্তু পরমহংস রামকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করার পরই তাঁহার জীবনে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ দ্বিধাযুক্ত চিত্তে নবযুবক পরমহংস দেবের উপদেশ শুনিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে অচিরাৎ রামকৃষ্ণের পদে আত্মবিক্রয় করিতে হইয়াছিল। পরম ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাপুরুষের প্রভাবে যুবক নরেন্দ্রের প্রতিভা অসামান্য বল সঞ্চয় করিয়াছিল। সেই প্রভাবে তাঁহার বাগ্মিতা স্ফূরিত হয়। তিনি গুরুদত্ত বিবেকানন্দ নাম ধারণ করিয়া সন্ন্যাস জীবন অঙ্গীকার করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ইনি রামনদের রাজা কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি স্বরূপ আমেরিকার অন্তঃপাতী চিকাগো নগরের ধর্ম্ম মহাসভায় প্রেরিত হন। তথায় তাঁহার বেদান্ত সম্বন্ধীয় উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় শ্রোতৃবর্গ মোহিত হইয়া যায়। আমেরিকাবাসীরা তাঁহাকে যে সম্মান ও আদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অন্য কোন ভারতবাসীর ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাত যাত্রা করেন, সেইখানেও তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যার বিশেষ প্রশংসা ও আদর হইয়াছিল। তাঁহার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার সময় কয়েকজন ইংরেজ ও আমেরিকাবাসী শিষ্যরূপে তাঁহার সঙ্গে আগমন করেন। ইঁহাদের মধ্যে মিস মারগেরেট নোবলের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইনি অতি শিক্ষিতা প্রতিভাশালিনী মহিলা। বিবেকানন্দ ইঁহাকে নিবেদিতা নাম প্রদান করেন এবং তিনি এখন সেই নামে ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিতা। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বিবেকানন্দ পুনরায় ধর্ম্ম প্রচারার্থে ইংলণ্ড ও আমেরিকা পর্য্যটন করিয়া আসেন; এই সময় তিনি আমেরিকা সেনফ্রেনসিস্‌কো নগরে বেদান্তবাদীদের একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রম তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর প্রযত্নে আমেরিকাতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বিবেকানন্দের আমেরিকাবাসী শিষ্য সম্প্রদায়ের অর্থে দক্ষিণেশ্বরের অপর তীরস্থিত বেলুড় নামক স্থানে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সুবৃহৎ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাগমন করেন এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দে উক্ত বেলুড় মঠে ইনি বহুমূত্র রোগে প্রাণত্যাগ করেন। বিবেকানন্দের রচিত গ্রন্থাবলী এবং বক্তৃতা সমূহ কলিকাতা ও মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল পুস্তক পাঠ করিলে তাঁহার অসামান্য মনস্বিতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংসারে সম্পূর্ণ উদাসীন যে বিষয়নিস্পৃহ যোগীকে য়ুরোপ-

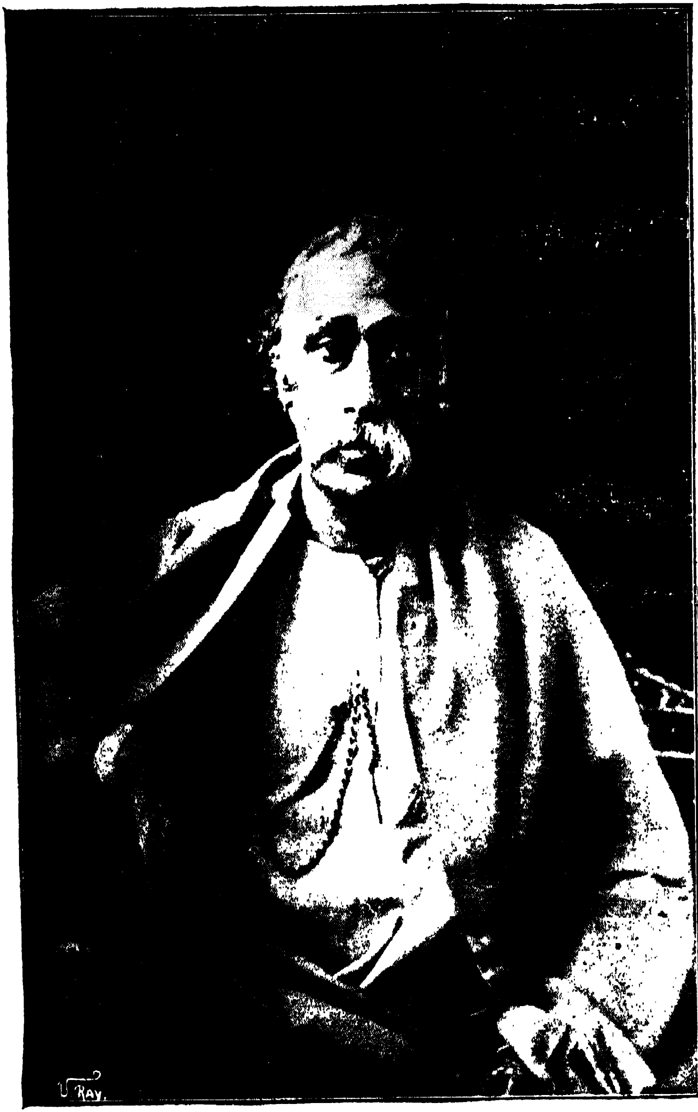
বাসীদের পক্ষে উপেক্ষা করাই স্বাভাবিক, বিবেকানন্দের সাহসিক উক্তি ও ভক্তির প্রবলতায় সেই পরমহংস দেবকে তাঁহাদের অনেকে নমস্য বলিয়া পূজা করিয়াছেন, ইহা অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে। বিবেকানন্দের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ম্যাক্সমূলর পরমহংস দেবের জীবনী প্রণয়ন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রকৃত বৈভব, এবং ইহার বর্ত্তমান অবস্থা ও পরিণাম সম্বন্ধে বিবেকানন্দ যে মতামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অসামান্য চিন্তাশক্তি ও স্বদেশ প্রেমের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আধুনিক সময়ে ইহার তুল্য ব্যক্তি অতি অল্পই এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।



প্যারীচাঁদ মিত্র।

প্যারীচাঁদ ১২২১ সালের ৮ই শ্রাবণ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা রামনারায়ণ মিত্র রাজা রামমোহন রায়ের প্রিয় সুহৃৎ ছিলেন। বাল্যে প্যারীচাঁদ বাঙ্গালা ও পার্শী ভাষা শিক্ষা করেন। অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিয়াও অচিরে ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কিন্তু গণিতশাস্ত্রের প্রতি ইহাঁর চিরকালই উপেক্ষা ছিল। ইনি ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখিয়া সুপ্রিম কোর্টের জজ গ্রাণ্ট সাহেবের প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করেন এবং ইংরেজী লিখিবার শক্তির জন্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠাভাজন হন। প্যারীচাঁদ সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া, সাধারণের হিতকর নানা কার্য্যে অক্লান্ত ভাবে যোগদান করেন। প্রথম পুলিসকমিসনে তাঁহার প্রদত্ত নির্ভীক সাক্ষ্য—তৎসময়ে বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল। প্যারীচাঁদ বেথুন সোসাইটির সেক্রেটারী, কলিকাতাস্থ জীবক্লেশ-নিবারিণী সভার সদস্য, সায়েন্স এসোসিয়েসনের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সদস্য প্রভৃতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, নানাভাবে দেশের জন্য পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত জীবক্লেশ-নিবারিণী সভায় তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে প্যারীচাঁদ বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য হইয়া ১৮৭০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ সভায় কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজীতে অনেক গ্রন্থ ও উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার রচিত ডেভিড্ সাহেবের জীবনচরিতে, অতি সুন্দর ইংরেজীতে তৎকালের একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। উহাতে ডিরোজিও ও তাঁহার ছাত্রগণের বৃত্তান্ত অতি কৌতুহলোদ্দীপক হইয়াছে। "কলিকাতা রিভিউ" পত্রিকায় ইহাঁর বিবিধ সারগর্ভ ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; তাহাতে জমিদার ও প্রজাসম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি বিলাতে হাউস অব কমন্স সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষাতে ইহাঁর কীর্ত্তি উল্লেখ যোগ্য। প্রথমতঃ তিনি "মাসিক পত্রিকা" নামক একখানি বাঙ্গলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। তৎপরে "অভেদী," "যৎকিঞ্চিৎ," "আধ্যাত্মিকা," "রামারঞ্জিকা" "রস্তামজী কাওসাজীর জীবনচরিত" "মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়" প্রভৃতি বিবিধ পুস্তক ও পুস্তিকা দ্বারা তিনি বঙ্গভাষায় এক নবযুগের সুত্রপাত করেন; কথিত চলিত ভাষাকে তিনি উপেক্ষা না করিয়া ভদ্রসাহিত্যে তাহার স্থান দান করিয়াছেন। তদ্রচিত "আলালের ঘরের দুলাল" বঙ্গভাষার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় পথ চিহ্নিত করিতেছে, এতৎসম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন—"ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুস্তক তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, অন্য কোন বাঙ্গলা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।" আলালের ঘরের দুলাল বাঙ্গলা ভাষায় একটা নূতন পথ দেখাইয়া দেয়। সংস্কৃত পদ সম্বলিত সংযত ভাষায় প্রচলিত দেশজ

শব্দের সংযোগ হইলে, ভাষা কিরূপ সরল মধুর ও সজীব হয়, তাহা আলালের দুলালের কল্যাণেই আধুনিক পাঠক দেখিতে পাইতেছেন। একজন সাহেব আলালের ঘরের দুলালের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন এবং কয়েকজন ইংরেজ সমালোচক ইহার অতি উচ্চস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পত্নী-বিয়োগের পরে প্যারীচাঁদ প্রেততত্ত্বের আলোচনায় মন দিয়াছিলেন। ১৮৮৩ সালের ২৩শে নভেম্বর প্যারীচাঁদ মিত্র পরলোক গমন করেন।


Ray.

স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল সরকার

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার হাবড়া জেলার অধীন পাইকপাড়া নামক গ্রামে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২রা নবেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ঠাকুরদাস মাষ্টারের পাঠশালায় প্রথম বর্ণপরিচয় পাঠ করিয়া পরে ৭ম বর্ষ বয়সে হেয়ার স্কুলে প্রবেশ করেন। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। পরে এই কলেজ বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হইলে মহেন্দ্রলাল পাঁচ বৎসর কাল তথায় অধ্যয়ন করেন। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ইনি মেডিকাল কলেজে প্রবিষ্ট হন। ইনি ছাত্রজীবনেই বৈজ্ঞানিক-বিদ্যায় এরূপ পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেন, যে অধ্যাপক আর্চ্চার ইঁহাকে, সহপাঠী ছাত্রবৃন্দের জন্য, দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে কতকগুলি বক্তৃতা করিতে বলেন। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে ইনি মেডিকাল কলেজের শেষপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় ইনি সকল বিভাগেই উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং অনেকগুলি মেডেল ও বৃত্তি দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে বিশেষ সম্মানের সহিত ইনি এম, ডি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, উপাধি প্রাপ্ত হন। এই বৎসর ইনি ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েসনের কলিকাতাস্থ শাখায় যোগ দান করেন এবং প্রথম যে বক্তৃতা করেন তাহাতে হোমিওপ্যাথিকে হাতুড়ে শিক্ষা বলিয়া যথেষ্ট নিন্দা করেন। তিন বৎসর কাল তিনি এই সভার সম্পাদকের কার্য্য সম্পাদন করেন এবং তৎপর ইহার সহকারি সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু ক্রমে তাঁহার চিত্ত হোমিওপ্যাথির প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার কথাবার্ত্তায় ও প্রবন্ধাদিতে এলোপ্যাথির প্রতি তাঁহার অনুরাগের অভাব প্রকাশিত হইতে লাগিল। ১৮৬৭ সম্বন্ধে তিনি একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধে হোমিওপ্যাথির সমর্থন করেন। পরবর্ত্তী বৎসরে স্বতন্ত্র চিকিৎসা-বিষয়ক পত্র প্রচার করিয়া হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে স্বীয় অনুরাগ, অনুসন্ধিৎসা ও আবিষ্কারের তত্ত্ব প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে তখনও লোকের মনে তাদৃশ আস্থা ছিল না। ডাক্তার সরকার এলোপ্যাথি সম্বন্ধে প্রকাশ্য ভাবে বিরাগ ঘোষণা করিলে, তাঁহার চিকিৎসা-ঘটিত পসার প্রতিপত্তি একবারে লুপ্ত হইবার উপক্রম করিল। তিনি যে প্রচুর প্রতিপত্তি ও চিকিৎসাখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় ব্যর্থ হইয়া গেল। এই সুনির্ম্মিত সুপ্রতিষ্ঠিত ভাগ্যের ভিত্তি স্বহস্তে চূর্ণ করিয়া তিনি অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ পথের যাত্রী হইলেন। কিন্তু ডাক্তার সরকারের মত লোক পৃথিবীতে অর্থের অর্জ্জনকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া কখনই গণ্য করেন না। তিনি দৃঢ় হস্তে হোমিওপ্যাথিকে ধরিয়া ছিলেন, এই জন্য বঙ্গদেশে আজ কাল ইহা এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আমেরিকার ও ইংলণ্ডের বড় বড় ডাক্তারদের নিকট মহেন্দ্রলালের নাম শীঘ্রই সুপরিচিত

হইয়াছিল। তিনি হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে নানা তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে ইনি ছোটলাট সার রিচার্ড টেম্পলের পৃষ্ঠপোষকতায় "বিজ্ঞান সভার" প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভায় বড়লাট, ছোটলাট, হাই-কোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ সর্ব্বদা উপস্থিত হইতেন। ডাক্তার সরকার একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী ছিলেন, তাঁহার সারগর্ভ বক্তৃতা শুনিয়া বড় বড় ইংরাজগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে-কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইঁহাকে "ডাক্তার অব ল" উপাধি প্রদান করেন। ইহার বহুপূর্ব্বে মহেন্দ্রলাল ইউনিভারসিটির ফেলো নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি বহুকাল সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন এবং অনেক সময়ে সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে মহেন্দ্রলাল কলিকাতার শেরিফের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ঐ বৎসর তিনি ছোটলাটের সভার সদস্যপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে সি, আই, ই, উপাধি লাভ করেন। মহেন্দ্রলাল অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হন, তিনি নানারূপ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রতিভা-বলে বঙ্গদেশে প্রতিপত্তিতে শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি মহোদয়গণের সঙ্গে অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। ধর্ম্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে ইনি একেশ্বরবাদী ছিলেন; এবং যদিও রামকৃষ্ণ পরমহংসের কোন অলৌকিক ক্ষমতায় তিনি বিশ্বাস করিতেন না, তথাপি পরম হংসের প্রতি তাঁহার ভক্তির অভাব ছিল না। ১৯০৩ খৃঃ অব্দে মহেন্দ্রলালের মৃত্যু হয়।



স্বর্গীয় আবদুল লতিফ্।

আবদুল লতিফ্ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে পূর্ব্ববঙ্গের অন্তঃপাতী ফরিদপুর জেলার অতি সম্ভ্রান্ত মুসলমানবংশে জন্মগ্রহণ করেন। আবদুল লতিফের পিতা কলিকাতার সদর দেওয়ানীর উকীল ছিলেন। ইহাঁর আদিপুরুষেরা তুরুস্কের বাগদাদ নগরে বসবাস করিতেন। কর্ম্মসূত্রে পূর্ব্বপুরুষদিগের এক জন এ দেশে আসিয়া, ফরিদপুরে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। আবদুল লতিফ কলিকাতা-মাদ্রাশায় অধ্যয়ন করেন এবং তথায় ইংরেজি ও পারস্য ভাষায় অসাধারণ অধিকার-লাভ করিয়া, সিনিয়র বৃত্তি উপভোগ করেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইনি শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন। কিন্তু তিন বৎসর পরে ইহাঁর গুণে মুগ্ধ হইয়া বঙ্গের প্রথম লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সার ফ্রেডরিক হেলিডে ইহাঁকে ডেপুটি মাজিষ্টর-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। নানাস্থানে অসাধারণ যোগ্যতা দেখাইয়া, ইনি শিয়ালদহের ফৌজদারী আদালতে অভিষিক্ত হন। মহকুমার সর্ব্বোচ্চ পদে সুখ্যাতিলাভ করিয়া, ইনি কয়েকবার কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। ডেপুটি-পদে ইনি নানা সময়ে নানারূপ সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় দিয়া, যে সকল মোকদ্দমার জটিলরহস্য ভেদ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে নানারূপ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। একটী দৃষ্টান্তেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন; তুরুস্কাদি-দেশীয় জগদ্বিখ্যাত কাজীরা যে উপায়ে জটিল মোকদ্দমায় সত্যনিষ্কাষণ করিতেন, আমাদের আবদুল লতিফও প্রায় সেইরূপ উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি করিতেন। প্রবাদ আছে, একবার একটা গুরুতর অপরাধের আসামীদিগকে কোনরূপে একবারে বাধ্য করিতে না পারিয়া, তিনি নিজের এক বিশ্বস্ত পুলিশ-কর্ম্মচারীকে মড়া সাজাইয়া, রাত্রিযোগে ঐ মৃতদেহের বহন-ভার ৪ চারি জন আসামীর স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া, তাহাদিগকে গোরস্থানের দিকে পাঠান। মুসলমানের শব বহিতে হইল বলিয়া, হিন্দু-আসামীরা ভয়ঙ্কর মনঃকষ্টে কাতর হইয়া, পথিমধ্যে আপনাদের অপরাধ উপলক্ষে অবাধে আলোচনা ও অনুতাপ করিতে থাকে। শবরূপী পুলিশকর্ম্মচারী সমস্তই কর্ণগোচর করেন। পরদিন আসামীরা ঐ সজীব শবের সাক্ষ্যে ও জেরায় অপরাধ স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, এবং তৎকালীন আইন অনুসারে অপরাধীরা দণ্ডিত হয়। আবদুল লতিফ ছোট লাটের ব্যবস্থাপক-সভায় অনেক দিনাবধি সদস্যের কার্য্য করেন। ১৮৬১ হইতে ১৮৬৫ সাল পর্য্যন্ত ইনি আয়কর-সম্বন্ধীয় কমিশনের একজন সদস্য হইয়া ছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আবদুল লতিফ্ কলিকাতা এবং হুগলীর মাদ্রাশা-কলেজের অবস্থাপরিদর্শনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া গবর্ণমেণ্টের ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। কলিকাতা মিউনিসি-পালিটির সদস্যরূপেও ইনি বিলক্ষণ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ইনি "মুসলমান লিটারারি সোসাইটীর" স্থাপন করিয়া, আজীবন তাহার সেক্রেটারী-পদে থাকিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটি, ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি প্রভৃতি নানাবিধ সভাসমিতিরই ইনি প্রধান সভ্য ছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লরেন্স

মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষাবিস্তার-পক্ষে ইহাঁর নানারূপ অনুষ্ঠান দেখিয়া প্রীত হন, এবং ইহাঁকে একটি সুবর্ণ-পদক ও এক সেট এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা উপহার দিয়া আপ্যায়িত করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ইনি "নবাব" উপাধি, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সি, আই, ই এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে "নবাব বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর ধারণা ছিল, যদি মুসলমানের নব্যসম্প্রদায় প্রাণপণে পাশ্চাত্য বিদ্যার অর্জ্জন না করেন, তবে হিন্দুদিগের সঙ্গে কখনই সমকক্ষতা করিতে পারিবেন না। নবাব আবদুল লতিফ্ বাহাদুর, মিষ্টভাষী, পরোপকারী এবং মুসলমান-সমাজের একজন প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন। ইনি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বন্ধুবাৎসল্যের পরিচয় দিতেন। হিন্দু-বন্ধুগণের উৎসবে ব্যসনে উপস্থিত থাকিয়া, প্রকৃত বন্ধুত্বের কার্য্য করিতেন। পরের বিবাদ মিটাইবার জন্য ইনি নিরন্তর ব্যস্ত থাকিতেন। কেবল ইহাঁরই মধ্যস্থতাগুণে অনেক গণ্য মান্য ধনিবংশ উচ্ছেদ অবসাদ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। নবাব বাহাদুরের মত মধুরভাষী নিরহঙ্কার এবং সামাজিক লোক আমরা অল্পই দেখিতে পাই।



স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র।

যমুনা নদীর তীরস্থ চৌবেড়িয়া গ্রামে ১২৩৬ সালের চৈত্রমাসে দীনবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন তাঁহার পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন,—দীনবন্ধু কোনরূপে পাঠশালায় সামান্ত লিখিতে পড়িতে শিখিয়াই জমিদার সরকারে ৮৲ টাকা বেতনের একটি কর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁহার লেখাপড়ায় প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ বশতঃ পিতার অনিচ্ছা সত্বেও তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতায় উপস্থিত হন; তখন তাঁহার বয়স ১৫।১৬ বৎসর মাত্র। কলিকাতায় আসিয়া তিনি তাঁহার পিতৃব্যের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, এখানে তাঁহাকে প্রায়ই নিজের রান্না করিয়া খাইতে হইত। নানা প্রকার অসুবিধা সত্বেও তিনি লং সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করেন। এখানে তিনি আর একটি কৌতুকাবহ কাণ্ড করিয়া বসেন,—দীনবন্ধুর নাম ছিল গন্ধর্ব্ব নারায়ণ মিত্র, শৈশবে বালকগণ তাঁহাকে 'গন্ধ' 'গন্ধ' বলিয়া ডাকিত, কেহবা বিদ্রূপচ্ছলে 'থু! গন্ধ!' প্রভৃতি বলিয়া তাঁহাকে রাগাইতে চেষ্টা করিত; গন্ধর্ব্বনারায়ণ মনে মনে স্বীয় পিতৃদত্ত নামটির উপর ভারি চটিয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং লং সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সময় নাম লিখাইতে যাইয়া আপনাকে 'দীনবন্ধু মিত্র' বলিয়া পরিচয় দিলেন, এ নাম তাঁহাকে কেহ দেয় নাই, এই নামকরণ স্বয়ংই করিয়াছিলেন। লং সাহেবের স্কুলেই তাঁহার ইংরাজীর হাতে খড়ি, তখন কে জানিত এই পাড়াগেঁয়ে বালকটি কালে নীল দর্পণের মত নাটক রচনা করিয়া ফেলিবেন, এবং স্বয়ং লং সাহেব তাহার অনুবাদ করিয়া জেলে যাইবেন! লংসাহেবের স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি অপর একটি ইংরেজী স্কুলে প্রবেশ লাভ করেন, এবং তথা হইতে জুনিয়ার স্কলারসিপ পাইয়া তিনি হিন্দু কলেজে পড়াশুনা করেন, তথায় সিনিয়ার স্কলারসিপ পাইয়া সম্মানের সহিত পাঠ সাঙ্গ করেন। পড়িবার সময় এবং উত্তর কালে তাঁহার অপূর্ব্ব একাগ্রতা সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা গিয়াছে। তিনি যখন পাঠ বা রচনা কার্য্যে নিবিষ্ট থাকিতেন, তখন সম্মুখে ভয়ানক গোলমাল, কি কোন ব্যাপার উপস্থিত হইলেও তাহা শুনিতে পাইতেন না;—অধ্যয়ন দ্বারা তিনি একরূপ যোগ সাধন করিতেন। পাঠ সাঙ্গের পর দীনবন্ধু ডাক বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন, কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন, এজন্য অতি শীঘ্র শীঘ্র তিনি উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়া, উক্ত বিভাগের সমুচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। লুসাই যুদ্ধে তিনি ডাকের ব্যবস্থার জন্য প্রেরিত হইয়া দক্ষতার সহিত কর্ত্তব্য সমাধান করিয়া ছিলেন। এজন্য সরকার বাহাদুর তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। হিন্দুকলেজে পড়িবার সময় দীনবন্ধু গুপ্তকবি-সম্পাদিত "প্রভাকরে" কবিতা লিখিতেন, বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বঙ্গভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া এই অনুরাগ বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। "নীল দর্পণই" তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এই নাটকের প্রভাবে নীল করগণের অত্যাচারের অবসান হয় এবং এদেশে ও বিলাতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, সুতরাং সাময়িক প্রভাবের

হিসাবে নাটকখানি শ্রেষ্ঠতম ফললাভে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু ইহার সাহিত্যিক নৈপুণ্যও প্রথম শ্রেণীর; ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, যে, বঙ্গভাষায় নীল দর্পণের ন্যায় উৎকৃষ্ট নাটক আর একখানিও নাই। নীল-দর্পণের পরে দীনবন্ধু "নবীন তপস্বিনী" "বিয়ে পাগলা বুড়ো" "সধবার একাদশী," "লীলাবতী," "সুরধুনী কাব্য," "জামাই বারিক," "দ্বাদশ কবিতা," "কমলে কামিনী" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। দীনবন্ধু বাবুর সুযোগ্য পুত্রগণ তাঁহার রচিত ছোট ছোট অনেক কবিতা সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার অধিকাংশই তাঁহার বাল্য রচনা ও প্রভাকরে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। দীনবন্ধু বাবুর পরিহাস রসিকতা উচ্চশ্রেণীর, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে পরদুঃখে যে গভীর সহানুভূতি রেখা পড়িত, নীলদর্পণ তাহার নিদর্শন ও কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ। তাঁহার রচিত অন্যান্য নাটকেও পরিহাসের অন্তরালে দেশের কুনীতির প্রতি অমিশ্র ঘৃণা ও দেশীয় লোকের কষ্টে আন্তরিক সহানুভূতি বিরাজমান। দীনবন্ধু বাবু যে আসরে কথা বলিতেন, সেখানে হাস্যরসের প্রস্রবণ বহিত। তিনি এরূপ উদার ও পরিহাসপ্রিয় ছিলেন যে, বিনা নিমন্ত্রণে অপরিচিত ভদ্র লোকের বাড়ীতে যাইয়া পরের জন্য বিস্তৃত আসনে উপবেশন পূর্ব্বক আহার্য্য চাহিয়া খাইতেন। বঙ্কিমবাবুকে তিনি নবীন তপস্বিনী উৎসর্গ করেন, বঙ্কিমবাবু মৃণালিনী তন্নামে উৎসর্গ করিয়া সেই ঋণ শোধ দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দীনবন্ধুর অকৃত্রিম বন্ধুতার ঋণ যে কিছুতেই পরিশোধনীয় নহে আনন্দমঠের ভূমিকায় তাহা বঙ্কিমবাবু আভাসে বুঝাইয়াছেন। মৃত্যুকালেও দীনবন্ধুর হাস্য প্রিয়তা যায় নাই, বঙ্কিমবাবু দেখিতে আসিলে বলিলেন,—"দেখলি ফোড়া এবার আমার পায়ে ধরিয়াছে।" ১৮৭৩ খৃঃ অব্দের ১লা নবেম্বর দীনবন্ধু স্বর্গারোহণ করেন।



স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন জেলা চব্বিশপরগণার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া গ্রামে রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মে কেবল কাঁটালপাড়া নহে, চব্বিশপরগণা জেলা মাত্র নহে, সমগ্র বঙ্গভূমি ধন্য হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র। যাদবচন্দ্র বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলের একজন খ্যাতনামা ডেপুটী ছিলেন। শৈশবেই তাঁহার প্রতিভার বিকাশ দেখিয়া সকলে পুলকিত ও বিস্মিত হইয়াছিল। মেদিনীপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ, সেখানে তাঁহার পিতা ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ হইতে সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। হুগলী কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি চতুষ্পাঠীর সংস্কৃত অধ্যাপকের নিকট চারি বৎসর সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার এই শিক্ষা কেবল বঙ্গ সাহিত্যের নহে, বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালিজাতির পক্ষে কল্যাণকর হইয়াছে। তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র ও গীতা বাঙ্গালীর চিন্তাশীলতা মীমাংসা ও তত্ত্বনিরূপণ শক্তির বিরাট জয়স্তম্ভ। সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই বঙ্কিমচন্দ্র বহু বিভিন্ন বিষয়ে। অসাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, প্রগাঢ় পণ্ডিতগণের পক্ষেও তাহা শ্লাঘার বিষয়। সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র আইন বিদ্যা শিক্ষা করিতে কলিকাতায় আসেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন তিনি আইন শিক্ষা করেন, সেই সময় বি, এ পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত হইল; তিনি দুই মাসের চেষ্টায় বি, এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইলেন। বঙ্গদেশের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বি, এ, উপাধিধারী। বঙ্কিমচন্দ্র অনেক বিষয়েই প্রথম। তিনি যাহাতে হাত দিয়াছেন, তাহাই প্রথম ও প্রধানস্থান অধিকার করিয়াছে। গণিতেও বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া সে সময়ের ছোটলাট হালিডে সাহেব তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করায় আর তাঁহার আইন পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই; তখন তাঁহার বয়স একুশ বৎসর মাত্র। ডেপুটীগিরি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ হইয়াছিল--একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যায়। কঠোর হাকিমী পরিশ্রমের পর তিনি যে টুকু অবসর পাইতেন, তাহা মাতৃভাষার সেবাতেই ব্যয়িত হইত। তাঁহার সুমধুর অবসরটুকু মাতৃভাষার সেবায় ব্যয় করিয়া তিনি আমাদের জন্য কি অমূল্য রত্নই রাখিয়া গিয়াছেন।—আমাদের আক্ষেপ হয়, তাঁহার অবসর কাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইল না কেন? বঙ্গভাষার প্রধান লেখকেরা প্রথমে ইংরাজী ভাষাতেই দেবী বীণাপাণির উদ্বোধন আরম্ভ করিতেন। মাইকেল মধুসূদন গৌড়জনবাসীর জন্য মধুচক্র রচনার অনেক পূর্ব্বে ইংরাজী ভাষায় 'ক্যাপ্টিভ লেডি' লিখিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও 'ইণ্ডিয়ান ফ্রেণ্ড' নামক

পত্রিকায় "Roymohan's wife" লিখিয়াছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি মাতৃভাষার সেবায় মন দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র শুভক্ষণে বঙ্গভাষায় উপন্যাস রচনা আরম্ভ করিলেন, এখানেও তিনি প্রথম ও প্রধান। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা মাসিকের আদর্শ সৃষ্টি করেন, দুর্গেশনন্দিনীতে তিনি বাঙ্গালা উপন্যাসের আদর্শ পাঠকগণের সম্মুখে প্রকটিত করেন। ১৮৬২ অব্দে দুর্গেশনন্দিনী প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৮৭২ অব্দে বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রকাশ। দেবীচৌধুরাণী বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইতে হইতে বঙ্গদর্শন বন্ধ হইয়া যায়। বঙ্গদর্শন জাহাজ বানচাল হইলে প্রচার ডিঙ্গী বঙ্গ সাহিত্যের সাগরে ভাসমান হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের মত কর্ণধার বর্ত্তমান থাকিতেও বঙ্গদর্শন-জাহাজ ডুবি বঙ্গদেশের পক্ষে কলঙ্কের কথা। বঙ্গদর্শনের পর তাঁহারই পোষকতায় "প্রচার" বাহির হইল। প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণ চরিত্র ও গীতার ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন, কিন্তু গীতাখানি তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই, এই গীতা বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাশীলতা, পাণ্ডিত্য, বিবেচনাশক্তি ও বুদ্ধি নৈপুণ্যের জীবন্ত নিদর্শন। ইহা ভারতবাসীর চিন্তার গতি নূতন পথে প্রধাবিত করিয়াছে। গীতার ব্যাখ্যাতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে তিনি বর্ত্তমান বঙ্গের শিক্ষকের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত অনুষ্ঠিত কর্ম্মের অপূর্ব্ব মিলন সংঘটিত করিয়াছে। হায় এমন পুস্তক তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলেন না! ১৮৮৭ অব্দে নবজীবন পত্রে বঙ্কিম বাবু ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিতে আরম্ভ করেন। ধর্ম্মতত্ত্ব পাঠ করিয়া বাঙ্গালী পাঠক হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা অবগত হইয়াছেন, হিন্দু ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার ইতিহাস রচনারও প্রথম প্রবর্ত্তক। এতদিন পরে দুই একজন বাঙ্গালী লেখক তাঁহার প্রদর্শিত পথে ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত বহুপ্রবন্ধে তাঁহার মৌলিকতা ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়: অতি কঠিন বিষয়কেও তিনি সরস ও সহজ বোধ্য করিয়া লিখিতে পারিতেন। ইংরাজী রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্যশক্তি ছিল, সুপণ্ডিত পাদরী হেষ্টি সাহেবকেও তর্কযুদ্ধে তাঁহার নিকট পরাভূত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার সমালোচনা শক্তি বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়, তাঁহার তীব্র কশাঘাত যাহার পিঠে পড়িয়াছে, সেই জানে তাঁহার বিদ্রূপ কি মর্ম্মভেদী। বঙ্কিমচন্দ্র বড় সহৃদয় বন্ধু ছিলেন। রাজদ্বারে তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল, তিনি নির্ভীক ভাবে রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন, কবিতা রচনাতেও বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমগ্র শক্তি ও প্রতিভা তিনি উপন্যাস রচনাতে ও ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপন্যাসের পরিচয় অনাবশ্যক। তাঁহার সূর্য্যমুখী, কমলমণি, আয়েসা, ভ্রমর, লবঙ্গলতা, বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে জীবন্তভাবে বিরাজ করিতেছে। তাঁহার চিরস্মরণীয় মহাসঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' আজ সমগ্র ভারতবর্ষে ধ্বনিত হইতেছে। আনন্দমঠ তাঁহার স্বদেশ-প্রেমের ফল। রাজকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রায় বাহাদুর ও সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত হন। বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির জন্য তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহার যোগ্য পুরস্কার প্রদানের উপযুক্ত সম্মান গবর্ণমেণ্টের নাই। ১৩০০ সালের ২৬ এ চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আত্মা দিব্যধামে যাত্রা করে।



শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১২৬৮ সালের ২৫এ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা জোড়াসাঁকোর সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন; রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। রবীন্দ্রনাথের পিতা ও পিতামহ দুই জনেই বঙ্গসমাজের সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি। পিতামহ তৎকালিন রাজকীয় সমাজে যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন; বাঙ্গালিসমাজের পক্ষে তাহা সেকালে অত্যন্ত দুর্লভ ছিল। একালের ত কথাই নাই। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মসমাজে যে গৌরবলাভ করিয়া গিয়াছেন, একালে তাহার তুলনা নাই। রবীন্দ্রনাথ কাব্য-জগতে যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহা অক্ষুণ্ণ রহিবে। বাল্যকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ বুদ্ধিমান্, এবং তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি প্রখর। তাঁহার চক্ষুর দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার দৃষ্টি হৃদয়ের অন্তর্দেশ হইতে কিরূপে মানুষটিকে খুঁজিয়া বাহির করে। এরূপ প্রখর অন্তর্দৃষ্টি ভিন্ন কেহ উচ্চ শ্রেণীর কবি হইতে পারে না। শৈশবেই তাঁহার কাব্যরস পিপাসু শিশু হৃদয় রামায়ণ ও মহাভারতের গল্পে তন্ময় হইয়া উঠিত। পাঠের জন্য তাঁহার প্রাণে এমন প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল যে, তিনি চারি পাঁচ বৎসর বয়সেই পাঠ করিতে শিখিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতে শিখিয়াছিলেন, তাঁহার সে সকল কবিতায় কবি হৃদয়ের স্বাভাবিক সরলতা, আবেগ ও মধুরতা ফুটিয়া উঠিত। রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন নর্ম্মাল স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন; তাহার পর বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া, লেখা পড়া করিবার সৌভাগ্য লাভ হয় নাই। তাঁহার পিতার তত্ত্বাবধানে তিনি শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর অনেক ঊর্দ্ধে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। শৈশবে রবীন্দ্রনাথ পিতার নিকট সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন; মাতৃহীন সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তানটিকে তিনি এমনই করিয়া চোখে চোখে রাখিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। পিতার চরিত্রের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের চরিত্র কিরূপ ভাবে অধিকার করিয়াছিল, তাঁহার এই পরিণত বয়সের চিন্তায় ও কার্য্যে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পিতার উপদেশে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পাঠ্য ইংরাজী জ্যোতিষ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিতেন—ইহাই তাঁহার বাঙ্গালা রচনার আরম্ভ, ১৬ বৎসর বয়সে তিনি ভারতী পত্রিকায় প্রথম প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মধ্যম সহোদর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথের সহিত অনেক দিন গুর্জ্জরদেশে বাস করেন, নানা গ্রন্থ অধ্যয়নে এ সময়ে তিনি জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করেন—তাহার পর ইংলণ্ড যাত্রা করেন। লণ্ডনের ইউনিভারসিটী কলেজে কিছুদিন তিনি সাহিত্য চর্চ্চা করেন, তখন সুবিখ্যাত মিঃ হেনরি মরলী সেখানকার অধ্যাপক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনের ইতিহাস ঠিক সাধারণের জীবনের মত নহে, তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহার

কাব্য গুলি বুঝিতে হয়। তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী। কবিতায় ও গদ্যে তাঁহার সমান অধিকার, এরূপ রচনাশক্তি অনন্য-দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন যোগ্যতার সহিত ভারতী-সম্পাদনে রত ছিলেন, তাহার পর শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সহযোগিতায় 'বালক' নামক একখানি সুখপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 'বালক' অল্প দিনের মধ্যেই উঠিয়া যায়, তাহার পর তিনি 'সাধনা'-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হন। প্রথম আমলের হিতবাদীতে তাঁহার যে দুই একটি গল্প বাহির হয় তাহা পাঠ করিয়াই সাহিত্য রসজ্ঞগণ বুঝিয়াছিলেন, গল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ক্ষমতা তাঁহার 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটি আমাদের বঙ্গীয় গৃহস্থ জীবনের সুন্দর আলেখ্য, হৃদয়ের ভাবে এমন চিত্র অঙ্কিত করা অল্প ক্ষমতার কার্য্য নহে। তাঁহার সম্পাদিত সাধনায় অনেক উৎকৃষ্ট ছোট গল্প প্রকাশিত হইয়াছে, বঙ্গসাহিত্যে তাহা স্থায়িত্ব লাভের যোগ্য। তাঁহার রচিত 'ক্ষুধিত পাষাণ'– 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের ও 'কচ ও দেবযানি'—'উর্ব্বশী' প্রভৃতি গাথা ও কবিতার ভাষা অনুপম। এমন ঝঙ্কারময়ী গীতি-মুখর ভাষায় রচনা করা বহু সাধনার ফল। উপন্যাস রচনাতেও রবীন্দ্রনাথ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনা শক্তি তীক্ষ্ণ, সৌন্দর্য্য স্ফূর্তিও অত্যন্ত প্রখর। রবীন্দ্রনাথ বহু কাব্য, উপন্যাস, কবিতা, গল্প ও নাট্য এবং গীতি নাট্য রচনা করিয়াছেন। সঙ্গীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগে এক নূতন আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার প্রণয় সঙ্গীতগুলি মার্জ্জিত রুচি ও সুকোমলভাবে সমলঙ্কৃত। কতকগুলি ধর্ম্মসঙ্গীত ও প্রেমসঙ্গীতের তুলনা নাই। কেবল সঙ্গীত রচনায় নহে, গান গাহিবার শক্তি তাঁহার অসাধারণ। তাঁহার জাতীয় সঙ্গীতগুলি 'স্বদেশী' আন্দোলনের দিনে বাঙ্গালীর হৃদয় অপূর্ব্ব পুলকে ও উৎসাহে পূর্ণ করিয়াছিল। রবীন্দ্র-নাথের সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলি অসাধারণ চিন্তাশীলতার সহিত লিখিত। তাঁহার ভাষা সতেজ, মধুর, সুললিত এবং ঝঙ্কারময়ী। কোন সভায় তিনি প্রবন্ধ পাঠের জন্য উপস্থিত হইলে সভাস্থলে যেরূপ জনপূর্ণ হয় তাহা দেখিলে বুঝিতে পারা যায় তাঁহার ভক্ত সংখ্যা কত অধিক। কবিতায় আজ কাল তাঁহার অসংখ্য অনুকরণকারী দেখিতে পাই নাই। উপমায় রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার কালিদাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার নৈবেদ্য নামক পারমার্থিক সঙ্গীত পুস্তকে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। সেকালের আর্য্যঋষি-দিগের সুপবিত্র শান্ত ও ব্রতনিরত জীবনের পক্ষপাতী প্রাচীন আদর্শে ছাত্রদিগের শিক্ষাদানের জন্য তিনি বোলপুর শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; এই আশ্রমের উন্নতিই তাঁহার জীবনের প্রধান সাধনা হইয়াছে। তাঁহার সম্পাদকতায় বঙ্গদর্শনের নবপর্য্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময়ে তাঁহার বহু কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার শেষ উপন্যাস নৌকাডুবী বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।



Kuntaline Press, Calcutta.

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত

অক্ষয়কুমারের পিতার নাম স্বর্গীয় পীতাম্বর দত্ত এবং মাতার নাম দয়াময়ী। বর্দ্ধমান জেলায় নবদ্বীপ-সন্নিহিত চুপী গ্রামে ১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ অক্ষয়কুমার কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৩৭ সালে দশমবর্ষীয় অক্ষয়কুমার গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া, খিদির-পুরে আসেন এবং পিতৃব্য-পুত্র হরমোহন দত্তের বাড়ীতে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। জয় মাষ্টার নামে এক ব্যক্তির নিকট অক্ষয়কুমার প্রথমে ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১২৪৩ সালে অক্ষয়কুমার কলিকাতার ওরেয়িণ্টাল সেমিনারী নামক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ ৺ গৌরমোহন আঢ্য দীনহীন বালকদিগকে বিদ্যাদান করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। অক্ষয়কুমারকে প্রত্যহ খিদিরপুর হইতে পদব্রজে এই বিদ্যালয়ে আসা যাওয়া করিতে হইত। এই সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়; তখন সংসারের সমস্ত ভার অপ্রাপ্তবয়স্ক অক্ষয়কুমারের উপর পতিত হয়। তিনিও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া স্কুল ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। স্কুল পরিত্যাগ করিবার পর তাঁহার জ্ঞানানুরাগ ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। তিনি অসাধারণ যত্ন সহকারে ইংরেজী, ফরাসী, জর্ম্মণ প্রভৃতি অনেকগুলি ভাষার অনুশীলন করেন। এই সময়ে "প্রভাকর"-সম্পাদক সুকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত অক্ষয়কুমারের পরিচয় হয় এবং প্রভাকরেই অক্ষয়কুমারের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা রচনা প্রকাশিত হয়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় "তত্ত্ববোধিনী" পাঠশালা স্থাপিত হইলে, অক্ষয়কুমার আট টাকা বেতনে তথায় একটি শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন—পরে এই বেতন বাড়িয়া ১৪৲ টাকা হইয়াছিল। এই সময়েই ইঁহার রচিত একখানি ভূগোল প্রকাশিত হয়। অনন্তর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যে ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাহচর্য্যে অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অক্ষয়কুমার অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অপরিমিত পরিশ্রমে পত্রিকাসম্পাদন করেন; তখন বঙ্গদেশে এই পত্রিকার অসাধারণ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। "বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার," "চারুপাঠ" "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়" প্রভৃতি গ্রন্থগুলির অধিকাংশ প্রথমতঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার রচনা ওজস্বিনী, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহিনী ছিল। কিন্তু বিষয়-নির্ব্বাচন ও ভাষা-বিশুদ্ধির জন্য তিনি অনেক সময়েই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সর্ব্বত্র মতের মিল হইত না। সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রথমতঃ সাতিশয় অনুরাগ ছিল, কিন্তু তাহা মহর্ষির অনুমোদিত নয় বলিয়া, অক্ষয়কুমারের রচনাগুলি আগে তিনি সমস্ত দেখিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করিতে দিতেন। যাহা হউক, অক্ষয়কুমারের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও রচনাশক্তি তাঁহাকে অচিরে তাৎকালিক বঙ্গীয় লেখকবর্গের মধ্যে অতি উচ্চ আসন

প্রদান করিয়াছিল। তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা-সম্পাদনের জন্য ইনি মাসিক ষাট্‌ টাকা মাত্র বেতন পাইতেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় নর্ম্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে অক্ষয়কুমার তথাকার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু এই সময়েও তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উন্নতিকল্পে শারীরিকও মানসিক পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই বৎসর আষাঢ় মাসে উপাসনাকালে এক দিন অক্ষয়কুমার সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তদবধি নিদারুণ শিরোরোগ তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। ১২৯৩ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ৬৬ বৎসর বয়সে অক্ষয়কুমার হাবড়া জেলার বালী গ্রামে প্রাণত্যাগ করেন। উৎকট শিরোরোগ লইয়াও ইনি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' প্রভৃতি পুস্তক-রচনার বিরাট শ্রমই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের প্রধান কারণ। অক্ষয়কুমার দত্তের রচিত বিবিধ পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার,"—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ; "চারুপাঠ" প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ; "পদার্থবিদ্যা"; "ধর্ম্মনীতি"; "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়,"—প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ। এই দ্বিতীয় ভাগ "উপাসক-সম্প্রদায়" যখন লিখিত হয়, তখন তিনি উৎকট ব্যাধি-যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর সহিত অক্ষয়কুমারের বিশেষরূপ সৌহৃদ্য ছিল; এই সৌহৃদ্যসূচক কতকগুলি সুন্দর পত্র "প্রবাসী" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানাদির প্রাচ্য পথে আলোচনা করিয়া, ধর্ম্ম ও আচার সম্বন্ধে নব্যমতের সূত্রপাত করিয়া, অক্ষয়কুমার বাঙ্গালা ভাষাকে নবজীবন দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সর্ব্ববিধ সংস্কার ও মতামতের ক্রমবিকাশে অক্ষয়কুমারের প্রচারিত সংস্কার ও মতামতের পরিণতি ও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে সত্য, কিন্তু তিনি যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, সে পথের এখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষা দত্ত-প্রদত্ত যে সজীবতায় সবল হইয়াছিল, সে সজীবতা কোন কালে তিরোহিত হইবে না।



স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ।

কালীপ্রসন্নের প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ সার টমাস রম্‌বোল্ড ও মিঃ মিড্‌ল্‌টনের দেওয়ানী কর্ম্ম করিতেন; তিনি মুর্শিদাবাদে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কালী-প্রসন্নের পিতার নাম নন্দলাল, কিন্তু তিনি "সাতু সিংহ" নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। ইঁহারা যোড়াসাঁকোর বিখ্যাত জমিদার। কালীপ্রসন্নের প্রকৃতি কতকটা অদ্ভুত রকমের ছিল। এক দিকে চাপল্য ও ক্ষণিক উত্তেজনা এবং অপরদিকে গুরুতর বিষয়ে প্রবীণসুলভ অপূর্ব্ব অনুরাগ, এই দুই বিরুদ্ধ দিক হইতে তাঁহার চরিত্রের বিকাশ হইয়াছিল। তিনি ইংরেজী বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত এই তিন ভাষায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার "হুতোমপ্যাঁচার নক্সা" নামক বাঙ্গালা গ্রন্থে অপভ্রংশবহুল চলিত ভাষায় যে সকল চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা কতকটা ক্ষণিক উত্তেজনা ও নবীনতাসুলভ চাপল্যের ফল বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু চিত্রগুলি কালে ঐতিহাসিকের চক্ষে আদৃত হইবে। প্রচলিত অমার্জ্জিত ভাষাকেও তিনি সাহিত্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন; এ সম্বন্ধে তিনি এবং টেকচাঁদ ঠাকুর [পিয়ারীচাঁদ মিত্র] লেখকসমাজে পথপ্রদর্শক। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের গদ্য বঙ্গানুবাদের জন্যই অতুল খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই মহৎ কার্য্যে তিনি রাজার ন্যায় মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। এই মহাভারতের অনুবাদ করিবার জন্য তাঁহাকে এশিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তক, শোভাবাজারের রাজবাটীর হস্তলিখিত পুস্তক, ৺ আশুতোষ দেব ও মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকাগারস্থিত হস্তলিখিত কতকগুলি প্রাচীন পুস্তক অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কাশী হইতে তাঁহার প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ একখানি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাও সবিশেষ উপকারে আসিয়াছিল। মহাভারতের ব্যাসকূটের সন্দেহনিরাকরণার্থ তিনি তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই মহৎ কার্য্য সুসিদ্ধ করিবার জন্য অনেক পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, কালীপ্রসন্ন তর্করত্ন, ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য্য, অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সমধিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই অনুবাদ সমাপ্ত হয়। এখনও প্রাঞ্জল ও সরস অনুবাদে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতই আদর্শরূপে পরিগৃহীত ও সমাদৃত হইয়া থাকে। প্রতিদিন মহাভারতের যতটুকু অনুবাদ হইত, স্বর্গীয় সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সায়ংকালে কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে আগমন করিয়া তাহা শ্রবণ করিতেন। অনুবাদে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই পথপ্রদর্শক হইয়া-ছিলেন। এই সকল সাহায্যের কথা উল্লেখ করিয়া সিংহমহাশয় লিখিয়াছেন, "এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি হিন্দু দলপতিরা আমার নির্দ্দিষ্ট

পাঠক ছিলেন।" মাইকেল যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন করেন, কালীপ্রসন্ন সিংহই প্রথমে তাহা "হুতোমপ্যাচা"য় ব্যবহার করিয়াছিলেন। পাঠক দেখুন, কালীপ্রসন্ন-বিরচিত "হুতোমপ্যাঁচা"র অমিত্রাক্ষরময় উৎসর্গটি কেমন সুন্দর!—

হে সজ্জন! স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে
রহস্য রসে রঙ্গে, চিত্রিনু চরিত্র,
দেবী সরস্বতী-বরে। কৃপাচক্ষে হের
একবার; শেষে বিবেচনা মতে যার
যা অধিক আছে, তিরস্কার কিম্বা
পুরস্কার, দিও তাহা মোরে,
বহুমানে লব শির পাতি।

কালীপ্রসন্ন ব্যয়ে অকুণ্ঠিত ছিলেন। অনেক সময়েই তিনি কেবল সহানুভূতি-প্রণোদিত হইয়া, পাত্রাপাত্র না বুঝিয়া, অতিরিক্ত দানশীলতার পরিচয় দিতেন। অর্থের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না; এই জন্যই শেষদশায় তাঁহাকে কষ্টে পতিত হইতে হইয়াছিল। মহাভারত প্রকাশকল্পে অজস্রব্যয়ে এবং অন্যান্য অনেক ব্যয়ে ও অকুণ্ঠিত দানে তাঁহাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। সেই জন্যই উড়িষ্যার বিস্তৃত জমিদারী এবং কলিকাতার বেঙ্গল ক্লবের ন্যায় কতকগুলি বাড়ী তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। তিনি যে বালকের ন্যায় সরলচিত্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার ঋণশোধ-প্রণালীতে প্রতিপন্ন হয়। কপটতাকে তিনি একান্ত ঘৃণা করিতেন। কপট ব্যবহারকে বড় ভয় করিতেন বলিয়াই, তিনি অনেক সময়ে সরলতাকে পরাকাষ্ঠায় আনয়ন করিয়া, নিজে অপরিণামদর্শী বলিয়া পরিচিত হইতেন। কিন্তু সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁহার স্বভাবে ও চরিত্রে যে সরল ও অমায়িক ভাব ছিল, তাহা অল্প লোকেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুণেই তিনি অনেক মহদাশয় লোকেরই স্নেহভাজন ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। কালীপ্রসন্ন কবে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখনও তাঁহার গুণ সকলে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি মরিয়াছেন, কিন্তু এক মহাভারতই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।



শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ।

ঢাকা জেলার অধিবাসী রায় দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ বাহাদুরের সুখ্যাতি পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র এখনও শ্রুত হইয়া থাকে। তিনি সুদীর্ঘকাল ডেপুটি কালেক্টরের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিজগুণে গবর্ণমেণ্টের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন; স্বদেশীয়লোকসমাজেও তাঁহার প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। মাননীয় বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ ইহাঁরই সুযোগ্য পুত্র। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী চন্দ্রমাধব জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমতঃ পুরাতন হিন্দু-কলেজে পাঠারম্ভ করেন। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে এই হিন্দু-কলেজ প্রেসিডেন্সি-কলেজে পরিণত হয়। দুই বৎসর পরে বর্ত্তমান ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে যাঁহারা প্রথম বৎসর এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, চন্দ্রমাধব তাঁহাদের অন্যতম। তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া, নূতন ইউনিভার্সিটির উপাধি লাভের জন্য পড়িতে আরম্ভ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের সংশ্লিষ্ট আইনের ক্লাসেপ্রবিষ্ট হইয়া, চন্দ্রমাধব তাৎকালিক আইন-অধ্যাপক পণ্ডিত-বারিষ্টার মণ্ট্রিয়ো সাহেবের অতি প্রিয়শিষ্য হইয়া উঠেন। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে চন্দ্রমাধব অতি প্রশংসার সহিত কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আদালতের উকীলের তালিকাভুক্ত হন এবং বর্দ্ধমানের জেলাকোর্টে ওকালতী কার্য্যের আরম্ভ করেন। তিনি অতি অল্পকালের মধ্যে এই কর্ম্মে সবিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন; ছয় মাস কাল অতীত না হইতে হইতেই তিনি সরকারী উকীলের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু এই সময়েই তিনি ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। এই কার্য্য তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। সুতরাং তিনি এ পদও ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। এইবার তিনি সদর-দেওয়ানী আদালতের উকীল হইয়া, প্রকৃত যোগ্যতাপ্রকাশের পথ পাইলেন। অনন্তর সদর দেওয়ানী ও সদর নেজামত হাইকোর্টে পরিণত হইলে, চন্দ্রমাধব হাইকোর্টেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে লাগিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে আইনগুরু মণ্ট্রিয়ো সাহেবের পদে কার্য্য করিয়া, তিনি স্বকীয় আইন বিদ্যায় ছাত্রদিগকে মুগ্ধ করেন। অনন্তর হাইকোর্টে ওকালতী করিতে করিতেই উক্ত আদালতের জজ পদে অভিষিক্ত হইয়া, স্বকীয় বিদ্যা, বুদ্ধি, সূক্ষ্মদর্শিতা, স্বাধীনতা প্রভৃতি গুণের পরিচয় দিবার অবসর পান। সার রমেশচন্দ্র মিত্রের ন্যায় চন্দ্রমাধবও হাইকোর্টের প্রধানতম জজ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দেশের ও সমাজের গৌরববর্দ্ধন করেন। বিচারক পদে যেরূপ স্বাধীনতা দেখাইতে হয়, সেরূপ স্বাধীনতায় ইনি কোন কালে কুণ্ঠিত হন নাই। স্বজাতি, স্বদেশ ও স্বসমাজের উন্নতিকল্পেও চন্দ্রমাধব ত্রুটি করেন না। জজ চন্দ্রমাধব ঘোষ পদোচিত সম্ভ্রম-রক্ষায় অকুণ্ঠিত; হাইকোর্টের বৃটিশ জজেরা চিরদিনই ইহাঁর যথোচিত এবং যথেষ্ট সম্মান করিয়াছেন। বড় বড় বৃটিশ বারিষ্টারেরাও জজ চন্দ্রমাধবের সহিত কথা কহিবার সময়ে সাবধান ও সংযতবাক্ হইতে বাধ্য হইতেন। অথচ চন্দ্রমাধব বন্ধুসমাজে অমায়িক ও সুরসিক বলিয়া পরিচিত। দেখিয়াছি, ভদ্র-জনসমাগমে চন্দ্রমাধব পরিচিত বা

অপরিচিত সকল ভদ্রলোকের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। মজ্‌লিসে চন্দ্রমাধবের মত মজ্‌লিসী লোক অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বাক্‌পটুতাও ঘোষ-প্রবরে যথেষ্ট আছে। ইনি যখন কথা কহেন, তখন সকলকেই শুনিয়া তৃপ্ত হইতে হয়। এই জন্য ইহাঁর কথা শুনিবার জন্য লোকে উৎসুক হয়। কায়স্থ সভার সভাপতিরূপে চন্দ্রমাধব যেরূপ সামাজিক অভিজ্ঞতা ও হিতৈষিতার পরিচয় দেন, ধীর ভাবে যেরূপ সকল দিকে সামঞ্জস্য রক্ষা করেন, সেরূপ অল্প লোককেই দেখিতে পাওয়া যায়। ঘোষ নিজগুণেই দেশবিখ্যাত হইয়াছিলেন। আশ্রিত বাৎসল্য, বন্ধুপ্রেম এবং আত্মীয় পালনে চন্দ্রমাধব চিরদিন অকুণ্ঠিত। কিছুদিন প্রধানতম জজপদে কার্য্য করিবার পরেই, চন্দ্রমাধব "সার" হইয়াছেন।



স্বর্গীয় রামকৃষ্ণপরমহংস।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়; তিনি অতি তেজস্বী ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। ক্ষুদিরাম রামোপাসক ছিলেন এবং পদব্রজে ভারতবর্ষীয় অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণকে শিশুকালে সকলে 'গদাধর' বা 'গদাই' বলিয়া ডাকিত। তিনি বাল্যকালে যাত্রাগান, কথকতা প্রভৃতি শুনিতে ভাল বাসিতেন, এবং সেই অনুকরণে সঙ্গী লইয়া খেলা করিতেন। ঐ গ্রামের জমীদারদের একটি অতিথিশালা ছিল, সেই অতিথিশালায় সর্ব্বদাই সাধুসন্ন্যাসীরা আসিতেন। কথিত আছে রামকৃষ্ণের মাতা এক দিন তাঁহাকে একখানি নূতন বস্ত্র পরাইয়া দিয়াছিলেন, ঐ অতিথিশালা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা দেখ, আমি কেমন সাধু হইয়াছি।" তাঁহার মা দেখিলেন, রামকৃষ্ণ নূতন কাপড় খানি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া সাধু সাজিয়াছেন। প্রবাদ আছে যে রামকৃষ্ণের যখন সাত বৎসর বয়স তখন উক্ত গ্রামের লাহা বাবুদের বাড়ীতে শ্রাদ্ধোপলক্ষে নানা দিগ্দেশ হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত হইয়াছিলেন; তাঁহারা রামকৃষ্ণের মেধা ও বুদ্ধিপ্রাখর্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। শৈশবেই রামকৃষ্ণের পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল ছিল না। রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতব্যবসায়ী ছিলেন, এবং কলিকাতায় ঝামাপুকুরে তিনি টোল করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। রামকৃষ্ণ পড়াশুনায় অমনোযোগী ছিলেন; এক দিন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছিলেন, "যে বিদ্যায় চা'ল কলা লাভ হয় তাহা শিখিয়া কি হইবে?" তিনি নিজে বলিয়া গিয়াছেন যে, যখন তাঁহার একাদশ বৎসর বয়স, তিনি তখন মাঠের উপর দিয়া যাইতেছিলেন—নীল আকাশে নীল মেঘ ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহা দেখিয়া তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞা লুপ্ত হয় এবং সেই দিন হইতেই তিনি "মায়ের" আবির্ভাব দেখিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার তাঁহাকে ঝামাপুকুরে লইয়া আসেন, রামকৃষ্ণ সুকণ্ঠ ও শ্রুতিধর ছিলেন, তিনি টোলের এক প্রান্তে বসিয়া নিশিদিন হরিনাম গুণগান ও শ্যামাসঙ্গীতে আত্মহারা হইয়া থাকিতেন। কিছু দিন পরে জানবাজারের রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে মন্দির প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। কিন্তু কোন পণ্ডিতই কৈবর্ত্ত বলিয়া তাঁহাকে মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা প্রদানে স্বীকৃত হন না। শেষে রামকুমারের নিকট ব্যবস্থা লইতে আসিলে তিনি বলেন যে, ঐ মন্দির কোন ব্রাহ্মণের দ্বারা উৎসর্গ করা হইলে তৎপ্রতিষ্ঠায় কোন বাধা নাই। রাণী রাসমণি সেইরূপ ব্যবস্থানুযায়ী গুরুকে দিয়া মন্দির উৎসর্গ করেন এবং রামকুমার স্বয়ং পৌরোহিত্যের ভার গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে রামকৃষ্ণ সর্ব্বদা দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। এক দিন তিনি আপনার মনে মহাদেবের মূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন, উহা দেখিয়া রাণী রাসমণির জামাতা মথুর বাবু আকৃষ্ট হন।

তিনি রামকৃষ্ণকে দেখিয়া চমৎকৃত হন; পরে রামকুমারের শরীর অসুস্থ হইলে মথুর বাবু নানা অনুনয় বিনয় করিয়া রামকৃষ্ণকে শ্যামাপূজার কার্য্যে ব্রতী করান। রামকৃষ্ণ বলেন যে, তিনি নিরক্ষর, পূজার নিয়মাদি কিছুই জানেন না। মথুর বাবু তাঁহাকে তবুও পূজা করিতে নিযুক্ত করেন। রামকৃষ্ণ বৈধ পূজার কোন ধার ধারিতেন না,—তাঁহার মনে যাহা ইচ্ছা হইত সেইরূপ করিতেন। আরতি করিতে করিতে কখনও তিনি বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িতেন এবং 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেন। কোন দিন বা আরতির সময় পঞ্চপ্রদীপ লইয়া দেবীকে বরণ করিতে ২। ৩ ঘণ্টা কাটিয়া যাইত, বাদ্যকরের হস্তে ব্যথা হইত, কাঁসর বাজাইতে বাজাইতে লোকটা পরিশ্রান্ত হইয়া অবাক্ ভাবে পুরোহিতের কাণ্ড লক্ষ্য করিত। যিনি জীবন দিয়া শ্যামামায়ের আরতি করিয়াছিলেন, সামান্য বাদ্যকর তাঁহার সঙ্গে তাল রাখিতে পারিবে কেন? দুই চারি দিন পরে রামকৃষ্ণ মথুর বাবুকে বলেন যে, তিনি আর পূজা করিতে পারেন না। তিনি এই সময় সর্ব্বদাই অচেতন অবস্থায় থাকিতেন। কখন কখন গঙ্গাতীরে বালুতে মুখ ঘসিয়া "মা" "মা" বলিয়া কাঁদিতেন। কখন কখন কাতর হইয়া কাঁদিয়া বলিতেন "মা আমার অহং জ্ঞান নাশ কর, দে মা আমায় দীনের দীন হীন ক'রে মা। মা আমি অষ্টসিদ্ধি চাই না, লোকমান্য হইতে চাই না, আমায় দেখা দে মা।" কখনও বা তর্পণ করিবার জন্য হাতে জল লইয়া শরীর এলাইয়া পড়িত, অবিরল চক্ষুজলে ভাসিয়া থর থর কাঁপিতেন এবং শিশুর ন্যায় 'মা' 'মা' বলিয়া আকুল হইয়া ডাকিতে থাকিতেন। দিন রাত এই ভাবে অনাহারে অনিদ্রায় কাটিয়া যাইত। রামকৃষ্ণ এই সময় কঠোর সাধনে প্রবৃত্ত হন, তোতাপুরী নামক জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট তিনি সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তোতাপুরী বৈদান্তিক যোগী ছিলেন। রামকৃষ্ণ যোগাসনে আসীন হইয়া এরূপ গভীর সমাধিতে বিমগ্ন হন যে, ছয় মাস কাল তাঁহার বিন্দুমাত্র বাহ্য সংজ্ঞা ছিল না। এক জন সাধু দণ্ডের দ্বারা প্রহার করিয়া করিয়া একটু চেতনা সঞ্চার করিতে পারিলেই মুখে দুধ এবং অপর কোন ভক্ষ্য দ্রব্য ঢালিয়া দিতেন; ইহাতেই তাঁহার শরীর কোনরূপে রক্ষা পাইয়াছিল। রামকৃষ্ণ জগতের সমস্ত ধর্ম্মমত সাধনা করিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি মুসলমান ধর্ম্মমতেও সাধনা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ মতে কোন সাধনা করিয়াছিলেন কি না তাহা কেহ বলিতে পারেন না, কিন্তু প্রস্তরনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি তাঁহার ঘরে দেখা যাইত। যিশুর ধ্যানেও তিনি তিন দিন নিমজ্জিত ছিলেন। এই ভাবে জগতের সমস্ত ধর্ম্মমত সাধন করিয়া তিনি প্রচার করেন "জগতের সকল ধর্ম্মই সত্য, সকলেরই লক্ষ্য এক।"



স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন।

কেশবচন্দ্র ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে কলিকাতা কলুটোলায় জন্মগ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্রের পিতামহ রামকমল সেন কলিকাতা বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার পিতা পিয়ারীমোহন সেন, কলিকাতার টাঁকশালের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে কেশবচন্দ্র হিন্দু-কলেজে প্রবেশলাভ করেন। তথায় কয়েক বৎসর পাঠ করিয়া মেট্রপলিটন কলেজে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু পুনরায় হিন্দুকলেজে আসিয়া ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে সিনিয়র স্কলারশিপ্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন না। বাল্যকালে কেশবচন্দ্রের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হইত; তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন। কৃষ্ণযাত্রা শুনিতে এত ভালবাসিতেন যে, অনেক সময়ে সারারাত্রি জাগরণ করিয়া যাত্রা শুনিতেন। বিদ্যালয়ত্যাগের পর তিনি বেঙ্গলব্যাঙ্কে ২৫৲ টাকা বেতনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। তাঁহার হস্তাক্ষর বড়ই সুন্দর ছিল, সুতরাং ক্রমে তাঁহার বেতনবৃদ্ধি হইল। কিন্তু এই সময়ে সুমহৎ ধর্ম্মব্রতের আহ্বানে তিনি কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেন এবং সার উইলিয়ম হামিল্টন, ভিক্টর কুজেঁ, মরেল, ম্যাক্‌কোশ, থিওডোর পারকার, ইমারসন, নিউ-মান প্রভৃতি দার্শনিক লেখকগণের গ্রন্থাবলী অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাদ্রী লঙ সাহেবের বক্তৃতাদি শুনিয়া, তিনি প্রথমে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরাগী হইয়া, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি-সমাজে যোগদান করেন। এই সময় হইতে তাঁহার বাগ্মিতায় সর্ব্বসাধারণ মুগ্ধ হইতে লাগিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্দ্রকে আচার্য্যের পদ ও ব্রহ্মানন্দ উপাধি প্রদান করিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে কলিকাতায় বাঙ্গলাভাষায় সুলভ সমাচার নামে এক পয়সা মূল্যের এক খানি ক্ষুদ্র সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আদি সমাজের এক মঙ্গলাচরণের পদ্ধতি লইয়া মতভেদ হওয়াতে, তিনি উক্ত সমাজ পরিত্যাগ করেন এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে একটি নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে কেশব ইংলণ্ডে গমন করেন, তিনি তথায় স্বীয় অসামান্য বাগ্মিতার প্রভাবে ইংরেজদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ভারতেশ্বরী রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া কেশবচন্দ্রকে সমাদরে স্বীয় প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তথায় রাজ্ঞী স্বহস্তে কেশবচন্দ্রের নাম লিখিয়া দুইখানি পুস্তক উপহার প্রদান করেন। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে কেশবচন্দ্র এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিবাহ সম্বন্ধে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের সিবিল আইন প্রধানতঃ কেশবচন্দ্রের যত্নে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজে অসবর্ণ বিবাহ এবং বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ হয়, এবং বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয়। এই আইন অনুসারে বিবাহিত ব্যক্তিদিগকে প্রতিশ্রুত হইয়া বলিতে হয় যে, তাহারা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ কিম্বা জৈন প্রভৃতি কোন প্রচলিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। কেশবচন্দ্র

এই সময়ে খ্যাতির চরম সীমায় উপনীত হন। প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে টাউনহলে ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতেন। ইহা শুনিতে শত শত ইংরেজ ও বাঙ্গালী সাগ্রহে সভাগৃহে সমবেত হইতেন। বড়লাট লর্ড লরেন্স কেশবের বক্তৃতা শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে বড়লাট নর্থব্রুক সাহেবও কেশবচন্দ্রের টাউন হলের বক্তৃতা শুনিয়া পরম প্রীতিপ্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংরেজীর ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায়ও তাঁহার অসামান্য বক্তৃতা-শক্তি প্রতিপন্ন হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রই কলিকাতায় বালকদিগের অধ্যয়নের নিমিত্ত এলবার্ট কলেজ স্থাপিত করেন। প্রসিদ্ধ এলবার্ট-হলও তাঁহারই যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে কেশবচন্দ্রের কন্যার সঙ্গে কুচবিহারের মহারাজের বিবাহ হয়। কেশবচন্দ্র নিজে বালিকাবিবাহের যে বয়সের সীমা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার কন্যার বিবাহে সেই নিয়ম নিজেই ভঙ্গ করেন। কিন্তু তিনি এ সম্বন্ধে, পরমেশ্বর কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছেন, এই মত প্রকাশ করিরা, আত্মকার্য্যের সমর্থন করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার সহিত তাঁহার দলের বিরোধের সূত্রপাত হয়; তাঁহার দলের বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের মে মাসে সাধারণসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্র নিজের পরমভক্তসমাজে থাকিয়া, নববিধান নামক নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করেন। ইহাতে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ইহাতে যেন বৈষ্ণব মতেরই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বধর্ম্মের শাস্ত্র উৎকৃষ্ট রূপে চর্চ্চা করিবার জন্য, ইনি কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্তকে নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ আরবী পাঠ করিয়া কোরাণ হইতে মুসলমান ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিতে অঙ্গীকার করেন, কাহারও প্রতি বা জেন্দাবস্থা বাইবেল ও হিন্দু শাস্ত্রালোনার ভার অর্পিত হয়। প্রাচীন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কেশবচন্দ্র যে সকল অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তদুত্তরে টাউনহলে তিনি “আমি কি প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ [redacted]?” নামক একটী সুদীর্ঘ ইংরেজী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার অসামান্য বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া, প্রতিপক্ষের দল, সেদিন তাঁহাকে প্রকাশ্যসভায় কোন অভিযোগে অভিযুক্ত করিতে সাহসী হন নাই। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দের ৮ই জানুয়ারী কেশবচন্দ্র লীলাসংবরণ করেন।



শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ।

ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে বাঁকুড়া জেলার একখানি সামান্য গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যবহারশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য, ব্যবস্থা প্রণয়নে নৈপুণ্য এবং ব্যবহার-জীবের ব্যবসায়ে অসাধারণ প্রতিভা, ইঁহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের অলঙ্কার স্বরূপ করিয়াছে। বাঁকুড়া সহরে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তিনি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রেরণের উপযোগী কোন ছাত্র না থাকায় তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে হয়, সুতরাং এই পরীক্ষার ফল তাঁহার প্রতিভার তুল্য হয় নাই। তদনন্তর, তিনি কলিকাতা আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং তথা হইতে এফে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরবৎসর ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ, পরীক্ষা দিয়া সম্মানের সহিত ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করেন। কলেজে পঠদ্দশায় ডাক্তার রাসবিহারী কেবল পাঠ্য পুস্তকের সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে নিজের জ্ঞানস্পৃহাকে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে দেন নাই। অতুল অধ্যবসায়ের সহিত ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেক্সপিয়রের গ্রন্থ তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। গ্রন্থগুলি এখনও তাঁহার বক্তৃতাগুলি সেই অমর কবির মর্ম্মস্পর্শী উক্তিতে ঝঙ্কৃত। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বি, এল ডিগ্রি লইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সেখানে অল্পকালের মধ্যেই ডাক্তার রাসবিহারী পাণ্ডিত্যে ও ব্যবহার শাস্ত্রের অভিজ্ঞতায় প্রবীণ প্রতিভাশালী দ্বারকানাথ মিত্রের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ের প্রথম কয়েক বৎসর ডাক্তার রাসবিহারি সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই সময়ে বিষাদের ক্ষণিক আক্রমণ হইতে তিনি রক্ষা পান নাই সত্য বটে, কিন্তু এই অবসরকাল তিনি ভারতীয় ও ইংলণ্ডীয় ব্যবহারশাস্ত্র পাঠে অতিবাহিত করেন। কেবলমাত্র ব্যবসায়ে সফল কাম হইবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন না। প্রত্যুত, ব্যবহার বিদ্যার পারিভাষিক আবরণ ভেদ করিয়া ব্যবহারবিজ্ঞানের অন্তঃস্তলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা চিরকালই তাঁহার ছিল। চারি বৎসর অক্লান্ত ও অব্যাহত পরিশ্রমের পর, তিনি Honors in Law পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলেন। চারি বৎসর পরে সুবিখ্যাত ব্যবহার-জীব প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দানে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর আইন অধ্যাপক স্বরূপে নিযুক্ত হইয়া "Mortgage" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতার ফল তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "Law of Mortgage in British India"—ভারতবর্ষে বন্ধক বিষয়ক আইন। ডাক্তার রাসবিহারী যখন স্বীয় অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন, তখন Transfer of property বিধিবদ্ধ হয় নাই আর এমন কোন গ্রন্থ ও ছিল না যাহাতে মূল্য নির্ণয়ের বিচার ও নজীরের একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হইত। সুতরাং ডাক্তার রাসবিহারীর গ্রন্থ ব্যবহারজীব ও বিচারক উভয় শ্রেণীরই এক মহাঅভাব মোচন করিয়াছিল। এখন যদিও উক্ত আইন সংহিতা আকারে বিধিবদ্ধ হইয়াছে তথাচ রাসবিহারী ঘোষের পুস্তক প্রামাণিক বলিয়া ব্যবহৃত

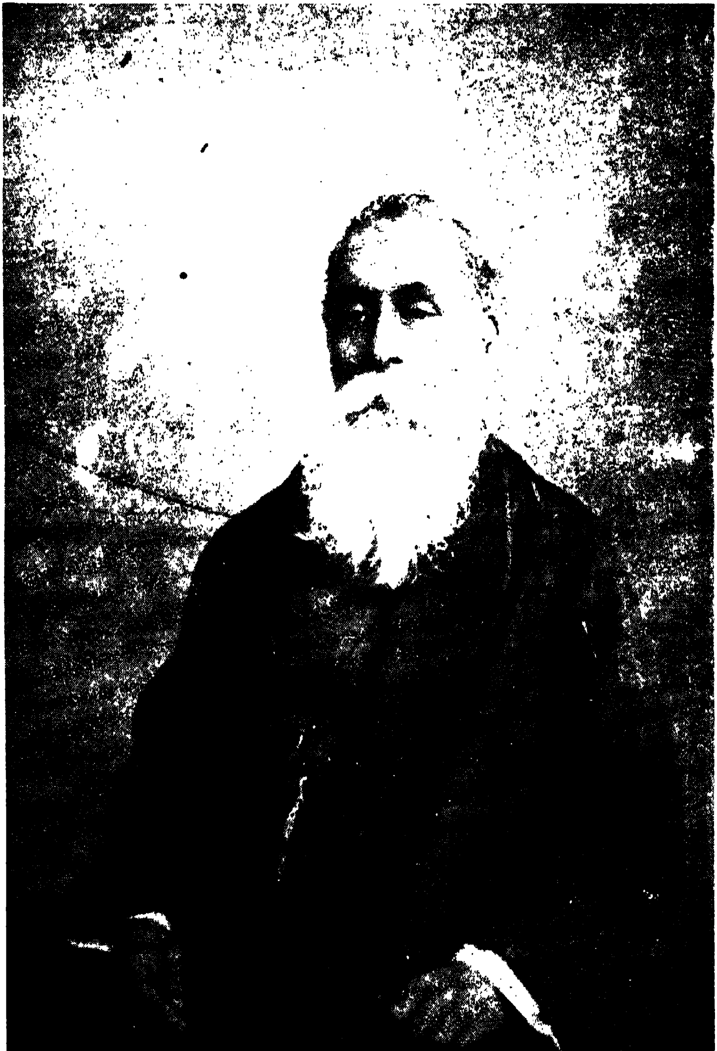
হইয়া থাকে। এমন পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তি সম্পন্ন ব্যবহার জীবের উন্নতি অবশ্যম্ভাবিনী, গত বিংশবর্ষকাল ডাক্তার রাসবিহারী কলিকাতা হাইকোর্টের উকীলগণের অগ্রণী বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহার বক্তৃতার ভাষা বিশুদ্ধ এবং ভঙ্গী পণ্ডিত জনোচিত। এতাদৃশ মানসিক শক্তি কেবল বিচারালয়ের কোলাহলের মধ্যে নিবদ্ধ থাকা সম্ভব নহে। তিনি ১৮৮৯ অব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে প্রবেশ করেন, আর ১৮৯১ অব্দে সার রমেশচন্দ্র মিত্রের স্থলে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। ১৮৯৩ অব্দে পুন মনোনীত হইয়া স্বয়ং দুইটি আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন। সেই দুইটি পাণ্ডুলিপি আইন রূপে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার পাণ্ডিত্যের সম্মানস্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি,এল, উপাধি দানে ভূষিত করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Senate এবং Syndicateএর সভ্য। তিনি প্রকৃত স্বদেশ প্রেমিক। লর্ড কর্জ্জন আমাদের জাতীয় চরিত্রের প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছিলেন, স্বাধীনভাবে তাহার সমালোচনা করিয়া তিনি দেশের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। তিনি জাতীয় মহাসমিতির পৃষ্ঠপোষক। এখন তাঁহার বয়স ৬৪ বৎসর। এ বয়সেও তাঁহার শরীর ও মন বিলক্ষণ সবল ও সতেজ আছে। আশা করা যায়, তিনি এই শক্তি তাঁহার স্বদেশের সেবাব্রতে নিয়োজিত করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত করিবেন।



শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে কালীপ্রসন্ন ঘোষ জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা শিবনাথ ঘোষ হিন্দুধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন, ইংরেজী শিখিয়া পাছে পুত্রের মতি-গতি বিগড়াইয়া যায় এই আশঙ্কায় তিনি কালীপ্রসন্নের ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। সুতরাং কালীপ্রসন্ন বাল্যকালে স্বগৃহস্থ "মকতবে" পার্শীভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু একদা বরিশালে জ্যেষ্ঠতাত শম্ভুনাথের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, ইংরেজী পড়িবার জন্য একান্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করাতে, তদনুগ্রহে তিনি স্বীয় ইচ্ছার অনুকূল অনুমতি প্রাপ্ত হন এবং পাদ্রীস্কুলে দুই বৎসর পাঠ করিয়া বরিশালে গভর্ণমেণ্টস্কুল স্থাপিত হইলে তথায় প্রবেশ লাভ করেন। কিন্তু এণ্ট্রান্স ক্লাশে উঠিয়া সংস্কৃতের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ নিবন্ধন পাঠ্য পুস্তকে অবহেলা করিতে লাগিলেন। ঢাকার কলেজিয়েট স্কুলে পাঠ কালে ইনি ভট্টিকাব্য খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করেন। ঢাকা কলেজের সংলগ্ন লুই সোসাইটিতে তের বৎসর বয়স্ক কালীপ্রসন্ন "পদার্থ বিদ্যানুশীলনের ফল" এবং "বন্ধুতা না হৃদয়বন্ধন" শীর্ষক দুইটি বাঙ্গালা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, শিক্ষকগণের বিশেষ উৎসাহ প্রাপ্ত হন। স্কুলের পড়ার প্রতি অবহেলা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল, এবং উন্নততর শিক্ষার জন্য কালীপ্রসন্নের মন লালায়িত হইল। কয়েক বৎসর পরে তিনি মুগ্ধবোধ, পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত কাব্যাদি রীতিমত পরিশ্রমসহকারে পাঠ করেন, এদিকে ক্যাণ্ট, কুঁশে, ফিক্‌টে ও কোমটে প্রভৃতির দর্শন পাঠ করিয়া শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের নিকটে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। বিংশবর্ষ বয়সে কালীপ্রসন্ন ভবানীপুরে সুধীসমাজের একটি সাহিত্য সভার অধিবেশনে, সভার নির্দ্দিষ্ট বক্তা মহেন্দ্রবাবুর প্রতিবাদ করিয়া, ইংরেজীতে যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহার ভাবী যশের প্রচুর সম্ভাবনা উপস্থিত বলিয়া সকলের উপলব্ধি হইয়াছিল। ক্রমে কালীপ্রসন্নের ইংরেজীতে বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা সাধারণের প্রকাশিত হইয়া পড়িল। কথিত আছে, তিনি কলিকাতা ভবানীপুরে "খ্রীষ্ট প্রচারিত খ্রীষ্টানধর্ম্ম এবং গির্জ্জার খ্রীষ্টানধর্ম্ম" শীর্ষক একটি ইংরেজী বক্তৃতা করিয়া, শ্রোতৃবর্গকে এমনই মুগ্ধ করিয়াছিলেন, যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এতদ্দেশীয় নেতৃবর্গ তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মার্কিণ বক্তা পডল সাহেবের উপদেশে ইনি ইংরেজী ছাড়িয়া বাঙ্গালায় বক্তৃতা ও গ্রন্থাদি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। ইনি বাঙ্গালা বক্তৃতায় যেরূপ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেরূপ ক্ষমতা অল্প লোকের ভিতরই দেখা যায়। তাঁহার ভাষা ওজস্বিনী এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং কণ্ঠস্বর উচ্চ, সংযত ও কবিত্বে ঝঙ্কৃত। অনেকের বিশ্বাস তাঁহার লিখিবার ক্ষমতা অপেক্ষা বলিবার ক্ষমতা অধিক। ইনি যে সভায় উপস্থিত থাকেন, তথায় সকলেই তাঁহার একটা প্রখর ব্যক্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন। "নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব" "ভক্তির জয়" "প্রভাতচিন্তা" "নিভৃতচিন্তা" "প্রমোদলহরী," "বিবাহ-

রহস্য” প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া ইনি বঙ্গের সাহিত্যরথীদের অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ইনি বহুকাল ভাওয়াল রাজবাড়ীতে দেওয়ানের কর্ম্ম করিয়াছেন। বঙ্গভাষার সেবার জন্য গবর্ণমেণ্ট রায়বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়া ইঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন। "বান্ধব" পত্র কালীপ্রসন্ন বাবুর সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। এক সময় বান্ধব পূর্ব্ববঙ্গ হইতে "বঙ্গদর্শনের" সমকক্ষতা করিতে সমর্থ হইয়াছিল,— বান্ধব বহুদিন লুপ্ত করিয়া রায় বাহাদুর ঢাকায় স্বীয় "বান্ধবকুটীরে" বসিয়া সরস্বতীর চর্চ্চা করিয়াছিলেন, এখন আবার প্রাচীন বয়সে বান্ধব পত্রিকাখানির পুনরুদ্দীপন করিতেছেন। কালীপ্রসন্ন বাবুর কল্যাণে বাঙ্গালা ভাষার একটা শক্তি ও তেজ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার কথাগুলি কোমল বনিতার ন্যায় নুইয়া পড়ে না,—পাণ্ডিত্য ও উদ্দীপনার দর্পে আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রবলভাবে তাহা মনোযোগ আকৃষ্ট রাখে। যাঁহারা বর্ত্তমান কালে বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবা করিতেছেন, তন্মধ্যে রায়বাহাদুর অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ।



স্বর্গীয় ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

পরলোকগত সুবিখ্যাত বাগ্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার হুগলীজেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া গ্রামে ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা মাতার প্রথম সন্তান, কাজেই বড় আদরে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। বাল্যকালে তাঁহাদের গ্রামের পাঠশালে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়, পরে হুগলী কালেজে এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতার হিন্দুকালেজের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। এই ক্লাশে তাঁহার পরীক্ষার ফল এত সন্তোষজনক হয় যে তাঁহাকে একবারে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ছয় মাস পরে আবার তাঁহাকে নিম্ন বিভাগ হইতে উচ্চ বিভাগে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই প্রকার দ্রুত প্রমোশনের ফল হইয়াছিল এই যে যদিও তিনি স্বাভাবিক প্রতিভাবলে ইংরাজী ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ক্ষতিপূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—কিন্তু গণিতে তিনি কাঁচাই রহিয়া গেলেন। ১৮৫৯ সালে তিনি কালেজ ছাড়িয়া ব্যাঙ্কের কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হন। কিন্তু এই সময় হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে তাঁহার মতিগতির পরিবর্ত্তন হইল। তাঁহাদের উপদেশে ও আদর্শে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হইল। তিনি আর ব্যাঙ্কের কাজ করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মসমাজের কাজে ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারের জন্য তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিলেন। এই সময়ে "ইণ্ডিয়ানমিরার" পত্রের প্রকাশ হওয়ায় তিনি এই পত্রিকাসম্পাদনে সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রতিভা ও অসাধারণ মানসিক শক্তি সমাজের নানা বিভাগের বিবিধ প্রকারের কাজে নিয়োগ করিলেন। পঁচিশ বৎসর বয়স হইতে তিনি আচার্য্যের কার্য্যে ব্রতী হইয়া ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী ভাষাতে বক্তৃতা ও উপাসনাদি করিতেন; তাঁহার বক্তৃতা ও উপাসনা বাগ্মীতার আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার ধর্ম্মভাব ও বাগ্মীতার যশ ইংলণ্ড আমেরিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার পুস্তক ধার্ম্মিক ও বিদ্বজ্জন সমাজে বিশেষ আদর ও সম্মানের জিনিষ। ১৮৭৪ সালে তিনি প্রথম বিলাত যাত্রা করেন, সেখানে তাঁহার বক্তৃতা সকলকে মোহিত করিয়াছিল, তাঁহার ভাব ও ভাষা দেখিয়া ইংলণ্ডের শ্রোতৃবর্গ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইত। ১৮৯৩ সালে আমেরিকার চিকাগো সহরে জগতের সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সম্মিলনীতে তিনি ভারতের একজন প্রতিনিধি স্বরূপ গমন করেন এবং "এসিয়ার নিকট জগতের ধর্ম্মঋণ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তাঁহার এই বক্তৃতার ভাবের গভীরতা ও ভাষার সৌন্দর্য্যে পৃথিবীর সর্ব্বদেশীয় শ্রোতৃবর্গ মোহিত হন। এই সময়ে তিনি বোষ্টন সহরে লাউয়েল ইনৃষ্টিটিউটে চারিটি বক্তৃতা দেন,—এই বক্তৃতা শ্রবণের জন্য এত লোক সমাগম হইত যে প্রত্যেক বক্তৃতা তাঁহাকে দুইবার করিয়া দিতে হইত। ১৮৮৩ সালে তিনি যখন দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন আমেরিকা ও জাপানের পথে ভূপ্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। ১৯০০ সালে তিনি শেষ বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার যে

অদ্ভুত বাগ্মীতায় সমগ্র জগতের সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহা তিনি কি প্রকারে লাভ করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস কৌতুকজনক। প্রথম প্রথম তিনি যখন বক্তৃতা করিতে উঠিতেন তখন প্রায়ই তাঁহাকে অপ্রস্তুত হইয়া বসিয়া পড়িতে হইত; কিছুই বলিতে পারিতেন না। তারপর একখানি কাগজে তাঁহার বক্তব্য লিখিয়া লইয়া তাহা বার বার আবৃত্তি করিয়া তারপর বক্তৃতা দিতেন; তাহাতেও কত ভুল হইত, কত বাদ পড়িত, কখন কখন ভুলিয়া গিয়া লজ্জিত হইয়া বসিয়া পড়িতেন; কিন্তু তথাপি ভগ্নোদ্যম হইতেন না। এমনি করিয়া তিনি নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এমনি অধ্যবসায়ের গুণে তিনি বাগ্মীসমাজে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিলেন এই অধ্যবসায়ের গুণেই তাঁহার প্রতিভা স্ফুরিত হইয়াছিল, তাঁহার যশ বহুদূরে বিস্তৃত হইয়াছিল। উত্তরকালে যাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছিল তাঁহারা জানেন যে কি সজ্জিত মনমুগ্ধকর সুন্দর ভাষায় তিনি বাংলা ও ইংরাজিতে উপাসনা ও বক্তৃতা করিতে পারিতেন। ইংরাজিতে Oriental Christ, Keshab Ch. Sen, A Study প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সে সকল পুস্তকের লিপি কৌশল বড় বড় ইংরাজ লেখকদিগেরও আদর্শ স্থল এবং ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার গভীর ও ঘনিষ্ঠ আলোচনার পরিচায়ক। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় পাঠ ও চিন্তায় অতিবাহিত হইত। তাঁহার জীবন ধর্ম্ম আলোচনা ও প্রচারে কাটিয়াছিল কাজেই বিবিধ ঘটনাপূর্ণ ছিল না। নিভৃতে আপনার আত্মা ও মনের উন্নতি সাধনই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও কাজ ছিল। শেষ জীবনে বৎসরের অধিকাংশ সময় তিনি হিমালয়ের সন্নিকট কার্সিয়াং পাহাড়ে পরমাত্মার ধ্যান ও চিন্তায় অতিবাহিত করিতেন। ১৯০৬ সালে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।



শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র।

দমদমার নিকটবর্ত্তী বিষ্ণুপুর গ্রাম নিবাসী ৺রামচন্দ্র মিত্র রমেশচন্দ্রের পিতা। তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। এই সমৃদ্ধিশালী পরিবারে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্রের জন্ম হয়। বিদ্যালয়ে তিনি প্রতিভাশালী ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু চিরদিন পাঠানুরাগী ও অধ্যবসায়শীল ছাত্র ছিলেন। বি, এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ১৮৬২ সালে হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ওকালতি আরম্ভ করিয়াই তিনি ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও উদ্যমের সহিত আইনের কঠিন সমস্যা, মীমাংসার ও গুরুতর তত্ত্ব সকল আয়ত্ব করিতে এবং বিজ্ঞ ও বহুদর্শী আইনজ্ঞ ব্যক্তিদিগের কার্য্য প্রণালী মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন চারি বৎসরের মধ্যেই তিনি একজন সুবিজ্ঞ উকীল বলিয়া বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। তখনকার শ্রেষ্ঠ উকীল ৺দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি রমেশচন্দ্রের সাহায্য লইয়া কার্য্য করিতেন। ১৮৬৮ সালে ৺দ্বারকানাথ যখন হাইকোর্টের জজ্ হইলেন, তখন রমেশচন্দ্র উকীলদিগের নেতা হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি আশৈশব সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ও অতি অল্প বয়সেই যে তিনি একজন নেতা ও বিখ্যাত উকীল হইতে পারিয়াছিলেন, তাহারও মূলে এই সত্য নিষ্ঠা। সত্যনিষ্ঠার সহিত সুস্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্য তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন করিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রে, বাক্যে ও ব্যবহারে লঘুতার লেশমাত্র ছিল না, অথচ তাঁহার ন্যায় বিনয়ী ও মধুর প্রকৃতির লোকও দুর্লভ। এই সকল দেবোচিত গুণের জন্যই, যখন দ্বারকানাথের মৃত্যু হইল, তখন, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে, ৩৪ বৎসরের যুবক রমেশচন্দ্রকেই হাইকোর্টের জজের পদে বরণ করা হইল। রমেশচন্দ্র ২৫ বৎসর এই কার্য্য অতি সম্মানের সহিত করিয়াছেন। একাধিকবার তিনি হাইকোর্টের প্রধান বিচার পতির কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার ব্যবহারে এবং বিচারে অন্যান্য সহযোগী বিচারকগণ, উকীলগণ এবং জনসাধারণ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অথচ তাঁহার নম্রতা ও শিষ্টতার পার্শ্বে অটল স্বাধীনচিত্ততা চিরদিন তাঁহার মহত্বকে উজ্জ্বল করিয়াছে। কি তাঁহার সহযোগী জজগণ, কি প্রধান বিচারপতি, কি আত্মীয় স্বজন ও সমাজ, কাহারও ভয়ে ভীত হইয়া রমেশচন্দ্র যাহা ঠিক বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহা বলিতে বা করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। তিনি যখন বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন, তখন এদেশবাসীর উচ্চ রাজকার্য্যে নিয়োগ লইয়া রমেশচন্দ্র সিংহের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন; অনেক সময় বড়লাটের মতের প্রতিবাদ করিতে ভীত হন নাই। অপরদিকে সমাজের ভয়ে হিন্দু রমেশচন্দ্র পুত্র ও জামাতাকে বিলাত পাঠাইতে বিরত হন নাই এবং তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে সমাজ ও স্বজনদিগের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহাদিগকে লইয়া একত্রে আহারাদি করিতেন। স্বদেশের জন্য তাঁহার প্রাণ

কাঁদিত, জন্মস্থান বিষ্ণুপুরে, তিনি স্বীয় ব্যয়ে দাতব্য চিকিৎসালয়, এণ্ট্রান্স স্কুল, ও বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। অনেক অসহায়া বিধবা, গরীব ছাত্র, এবং অনেক অন্ধ খঞ্জ তাঁহার দানের উপর নির্ভর করিত। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাদের জন্য স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া ছিলেন। মৃত্যুর ৯ বৎসর পূর্ব্বে তিনি শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ জজিয়তি পরিত্যাগ করেন। সেই সময় হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, গভীর অধ্যয়ন, ও স্বদেশের সেবায় বিশেষরূপে লিপ্ত ছিলেন; তিনি জাতীয় মহা সমিতির একজন মন্ত্রণাদাতা ও সহায় ছিলেন: ১৮৯৬ সালে যখন কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হয়, তখন রুগ্ন ভগ্ন দুর্ব্বল শরীর লইয়া অসাধারণ পরিশ্রম করিতে করিতে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেবার তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে কার্য্য করিয়া ছিলেন। তিনি যেমন বিদ্বান, তেমনি বিনয়ী, যেমন দানশীল তেমনি সৎসাহসী, যেমন চরিত্রবান্ তেমনি স্বদেশসেবক ছিলেন। ১৮৯৯ সালের ১৩ই জুলাই তাঁহার মৃত্যু হয়।



শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুবিখ্যাত আইনজ্ঞ পণ্ডিত ও শিক্ষানীতিপ্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার সন্নিকটস্থ নারিকেলডাঙ্গায় ইং ১৮৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। গুরুদাস পরলোকগত পণ্ডিত পীতাম্বর তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার ছাত্র জীবনের কৃতিত্ব দেখিলেই তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। প্রত্যেক পরীক্ষায় তিনি যথাসম্ভব কৃতকার্য্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৫ সালে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সুবর্ণপদক পুরস্কার লাভ করেন পরবৎসরেই বি, এল, পরীক্ষায় পাশ করিয়া হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। ১৮৬৬ হইতে ১৮৭২ সাল পর্য্যন্ত তিনি বহরমপুর কলেজের আইন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন এবং ১৮৭৭ সালে বি, এল উপাধি লাভ করিয়া সেই বৎসরই ঠাকুর আইন অধ্যাপক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ১৮৮৯ হইতে ১৮৯১ পর্য্যন্ত 'ভাইস্‌-চ্যান্‌সেলার' পদে নিযুক্ত থাকেন। এই পদে থাকিয়া ও সাধারণ সদস্যরূপে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ও যাবতীয় শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। মিউনিসিপাল কমিশনার ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপেও তিনি দেশের অশেষবিধ মঙ্গলকার্য্য করেন। ১৮৮৭ সালে তিনি অবৈতনিক Presidency Magistrate নির্ব্বাচিত হন এবং ১৮৮৯ সালে তাঁহার অসামান্য আইনজ্ঞতা ও মহৎ চরিত্রের যথাযোগ্য পুরস্কার স্বরূপ ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদলাভ করেন। সুদক্ষ কার্য্যতৎপরতা, ন্যায়শীলতা ও স্বাধীন বুদ্ধিবত্তার সহিত গুরুদাস ১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত ঐ বিচারপতি পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯০২ সালে তিনি লর্ড কর্জ্জন প্রারব্ধ University Commission এর সদস্য নিযুক্ত হন এবং তন্নিয়োগে দেশের অশেষ উপকার বিধান করেন। ঐ ব্যাপারে তাঁহার মতপার্থক্যজ্ঞাপক যে লিপি প্রকাশ করেন, তাহা সমস্ত দেশের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সুখ্যাতি আকর্ষণ করিয়াছিল। তদীয় অভিমত কর্তৃপক্ষের বিবেচনাগ্রাহ্য হইলে উক্ত কমিশনের অনিষ্টকর নিয়মাবলী প্রভূত পরিমাণে নিয়মিত হইতে পারিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাহউক, বিশ্ববিদ্যালয় আইনানুমোদিত নব প্রারব্ধ নিয়মাবলী তাঁহার বিচক্ষণ পরামর্শ ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের গুণে অনেক পরিমাণে ব্যবহারযোগ্যতা লাভ করিয়াছে। ১৯০৪ সালে গুরুদাস 'নাইট' উপাধি লাভ করেন। তাঁহার প্রণীত বিবাহ ও স্ত্রীধন সম্বন্ধীয় হিন্দু আইন বিষয়ক "ঠাকুর আইন বক্তৃতা" আইন শিক্ষার্থীদিগের নিকট অত্যন্ত আদর লাভ করিয়াছে। গণিত, জ্যামিতি, শিক্ষা ও দেবনাগর বর্ণমালা প্রচলন সম্বন্ধে তাঁহার যে সকল সারগর্ভ পুস্তক আছে তাহাতে সাধারণের নিকটে সবিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। সার গুরুদাস, তাঁহার উদারচরিত্র, অসাধারণ বদান্যতা, অমিশ্র স্বদেশানুরাগ, অগাধ পাণ্ডিত্য, অসীম কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি বহুতর সদ্‌গুণে

সর্ব্বসাধারণের সুখ্যাতি ও ভক্তিভাজন। দরিদ্র ও নিঃসহায়ের তিনি নিত্যবন্ধু। দেশের ও দশের যাবতীয় কার্য্যে তাঁহার অবিচলিত অনুরাগ। নিজে প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইয়াও, সকল ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ এবং তন্নিবন্ধন পূর্ব্বপন্থী ও উন্নতিশীল, সনাতন প্রথাবলম্বী ও সার্ব্বভৌমিক, সর্ব্বশ্রেণীর শ্রদ্ধাভাজন। অধুনাতন দেশীয় রাজনৈতিক বিবাদব্যাপারে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে স্বদেশীদলের সমভুক্ত করিয়াছেন এবং জাতীয় শিক্ষাসভা ও বঙ্গীয় শিল্পানুষ্ঠান প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারে তাঁহার সকল চেষ্টা ও ক্ষমতা নিয়োগ করিয়াছেন। বয়োবৃদ্ধ হইলেও, তাঁহার পরিশ্রমশক্তি ও কার্য্যদক্ষতা নব্যব্রতীদিগের আদর্শস্থল। গভীর জ্ঞান ও মহৎ চরিত্রবলে নব্যযুবকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।



শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত।

রমেশচন্দ্র কলিকাতায় রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্তবংশে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হেয়ারস্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সীকলেজে অধ্যয়ন করেন। রমেশচন্দ্র শৈশব হইতেই প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত এবং ইনি একত্রে বিলাত গমন করেন ও "সিবিল সারভিস্" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। সেই সময়েই তিনি "ইউরোপে তিন বৎসর" নামক প্রবাস বিষয়ক ইংরাজী গ্রন্থ লেখেন। অতি দক্ষতা ও সম্মানের সহিত বহুদিন রাজকার্য্য করিয়া, ইনি অবশেষে ভারতবাসীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বিভাগীয় কমিসনারের পদ প্রাপ্ত হন। এই রাজকার্য্য সম্পাদন কালে তিনি দেশের মঙ্গলের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া স্বীয় কার্য্য করিয়াছেন, গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রয়োজনীয় রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন, এবং জনসাধারণকেও সাহায্য করিয়াছেন, এবং উৎসাহ দিয়াছেন। ইতিহাস, সাহিত্য ও রাজনীতি এই তিন বিভাগেই তিনি অতি সুপণ্ডিত। ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত তিন ভাষাতেই তিনি তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা, প্রতিভা এবং অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন। ইংল্যাণ্ড হইতে ফিরিয়া আসার পর গুরুতর রাজকার্য্যে লিপ্ত হইয়া, তিনি কখনও চিন্তাও করেন নাই যে তাঁহার দ্বারা আবার বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। একদা বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত কথা প্রসঙ্গে, বঙ্গসাহিত্যের কথা উঠিল। তিনি রমেশচন্দ্রকে বলিলেন "তুমি বাঙ্গলা ভাষায় লেখ না কেন?" রমেশচন্দ্র বিস্মিত হইয়া উত্তর দিলেন, "আমি যে বাঙ্গলা একবারেই জানি না, তা লিখিব কি?" বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন "তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যা লিখিবে তাহাই ভাষা হইবে।" সেই যে রমেশচন্দ্র বাঙ্গলার সাহিত্য ক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন; তিনবৎসর সাধনের পর চার খানি হৃদয়গ্রাহী ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়া বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত হইয়া গেলেন। ইতিহাস, সাহিত্য ও রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি তিন ভাষাতে পাণ্ডিত্য পূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়া জগৎ বিখ্যাত হইয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ঋগ্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং অতি কঠিন গ্রন্থাবলী। রমেশচন্দ্র দৃঢ়তর পরিশ্রম করিয়া সমস্ত ঋগ্বেদ সংহিতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই কার্য্যই একজন প্রতিভাশালী জ্ঞানীব্যক্তির সমস্ত জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। তদনন্তর তিনি ইংরাজীভাষায় প্রাচীন ভারতের সভ্যতার যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য, গবেষণাশক্তি ও পরিশ্রম করিবার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, সমস্ত সভ্য জগৎ বিস্মিত। অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগের জন্য, ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় দুই খানি স্বল্পায়তন ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়াছেন। তিনি ইংরাজীভাষায় বঙ্গসাহিত্যের যে সুন্দর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহার দ্বারা বঙ্গভাষা বিদেশীর

নিকটও গৌরবান্বিত হইয়াছে। বাঙ্গলায় প্রথমোক্ত কয়েক খানি উপন্যাস ব্যতীত তিনি আরও দুই খানি সামাজিক উপন্যাস লিখিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের সুকোমল ভাব সমূহের ও সামাজিক আদর্শের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইনি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইংল্যাণ্ড্ গমন করেন; এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিষয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেই হইতে তিনি পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়া, প্রবন্ধ লিখিয়া এবং বক্তৃতা দিয়া—নানা প্রকারে স্বদেশের মঙ্গল সাধনে লিপ্ত আছেন। :ইনি ১৯০০ সালে জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি পদে মনোনীত হইয়াছিলেন। কয়েকবৎসর ধরিয়া দেশের সেবাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য হইয়াছে। ইতিমধ্যে তিনি ইংরাজিতে ভারতের অবস্থা বিষয়ে কয়েক খানি পুস্তক লিখিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ইহার সমস্ত গ্রন্থই পণ্ডিত সমাজে আদৃত হইয়াছে। এখনও ইনি নানাপ্রকারে দেশের হিতসাধনে লিপ্ত।



শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত পানীসেওলা নামক গ্রামে সারদাচরণের জন্ম হয়। সারদাচরণের পিতা কলিকাতার কোন হৌসে মুচ্ছুদ্দীর কর্ম্মে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ঈশান বাবু উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থ ছিলেন, সারদাচরণের জননীও সদ্বংশীয় কায়স্থের কন্যা। সারদাচরণের জননীর নাম ভগবতী দাসী; সারদাচরণের ন্যায় বংশোজ্জ্বল সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়া ভগবতী যে রত্নগর্ভা হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৮৫৩ অব্দে পাঁচ বৎসরের শিশু পুত্রকে রাখিয়া, সাধ্বী ভগবতী স্বর্গারোহণ করেন। সারদাচরণের পিতা শিশুপুত্রের পিতামাতা উভয়ের স্থান অধিকার করিলেন। কলিকাতায় পিতার নিকট থাকিয়া শিশু সারদাচরণ বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী হন। ১৮৫৭ অব্দে সারদাচরণ কলুটোলার বয়েজস্কুলে প্রবিষ্ট হন, পরে এই বিদ্যালয়ই হেয়ার স্কুল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রতিভা কখন চাপা থাকে না। প্রতিভাবান্ সারদাচরণ অল্প দিনের মধ্যেই মেধাবী ছাত্র বলিয়া বিদ্যালয়ে খ্যাতিলাভ করিলেন। তাঁহার স্মরণশক্তি ও পাঠানুরাগে তাঁহার প্রতি শিক্ষকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৬১ অব্দে ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র বয়সে সুমধুর কৈশোর অতিবাহিত হইতে না হইতে সারদাচরণ পিতৃহীন হইলেন। এই দারুণ শোকে সারদাচরণ নিতান্ত সন্তপ্ত হইলেন; কিন্তু তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন না; একান্ত মনে অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইলেন; বিধাতা তাঁহার সাধনার উপযুক্ত পুরস্কারে বঞ্চিত করেন নাই। সারদাচরণ ১৮৬৫ অব্দে প্রবেশিকা ও ১৮৬৭ অব্দে এল এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং গণিতে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া ডফ্ বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৬৮ অব্দে সার রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণমোহিনী দাসীর সহিত তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৮৭০ অব্দে সারদা বাবু বি এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ঈশান বৃত্তি লাভ করেন, এবং বি এ পরীক্ষার একমাস পর এম এ পরীক্ষা দিয়া সসম্মানে উত্তীর্ণ হইলেন; পরবৎসর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভের অধিকারী হন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি দশহাজার টাকা সারদাচরণের পর আর কেহ পান নাই, এণ্ট্রেন্স পাশের পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে আর কেহ ঐ বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, সারদাচরণের পক্ষে ইহা অল্প গৌরবের কথা নহে। অতঃপর আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সারদাচরণ হাইকোর্টের উকীল হইলেন। তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা, অসাধারণ ধীশক্তি, গভীর আইন-জ্ঞান তাঁহার সহায় ছিল, সেই জন্য অল্পদিনের মধ্যে অন্যের সহায়তা নিরপেক্ষ হইয়াও তিনি প্রচুর খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিলেন, বিজ্ঞ ব্যবহারাজীব বলিয়া সমাজে পরিচিত হইলেন। সমাজ-হিতকর কার্য্যে সারদা বাবু আজীবন সচেষ্ট; হিন্দু বিধবার পুনর্ব্বিবাহ সমাজে

প্রচলিত করিবার জন্য তিনি প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। বিধবা-বিবাহ সমিতির সম্পাদকরূপে তিনি যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। ১৮৮৪ অব্দে সারদাচরণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচিত হন; তিনি সংস্কৃত বোর্ড ও আইনের ফ্যাকল্টির সভ্যরূপে যে যোগ্যতার পরিচয় দেন, তাহারই ফলে তিনি ১৮৯২ অব্দে আইন ফ্যাকল্টির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সারদাচরণের আর একটি সৎকার্য্য বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য, তিনিই প্রথম হিন্দু বোর্ডিং স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৯৫ অব্দে সারদাচরণ ঠাকুর আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯০২ অব্দে সারদাচরণ অস্থায়ী ভাবে হাইকোর্টের বিচারপতি পদে মনোনীত হন। বুদ্ধগয়ার বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার জন্য তিনি সেখানে গিয়া যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা, দূরদর্শিতা ও অপক্ষপাত বিচারের চূড়ান্ত নিদর্শন বলিয়া রাজপুরুষগণের নিকট সমাদৃত হইয়াছিল। সারদাচরণের যশোভাগ্য নিত্য প্রসন্ন, কোন কার্য্যভার হস্তে লইয়া একদিনের জন্যও তাঁহাকে অপযশভাজন হইতে হয় নাই। ১৯০৪ অব্দে হাইকোর্টের সর্ব্বজন বন্দনীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পদত্যাগ করিলে সারদাচরণ তাঁহার পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। তাঁহার নিয়োগ সর্ব্বজনের অনুমোদিত হইয়াছিল। এইরূপ গুরুতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও সারদাচরণ দীনা বঙ্গভাষাকে বিস্মৃত হন নাই; সাধ্যানুসারে তিনি মাতৃভাষার সেবা করেন; ইংরাজী সাময়িক পত্রাদিতেও তাঁহার নানা বিষয়ক প্রবন্ধ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হয়। সারদাচরণ সমগ্র ভারতে একাকার বর্ণমালা প্রচলিত করিবার বিশেষ পক্ষপাতী, এ বিষয়ে তাঁহার অনেকগুলি চিন্তাশীলতা পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহা তাঁহার দূরদর্শিতার ফল। এই একটিমাত্র উদ্যমে তাঁহার স্বদেশের প্রতি অনুরাগ ও তাঁহার মঙ্গলচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাঁহার সারগর্ভ মত শ্রেষ্ঠ ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদকগণেরও সমর্থন লাভ করিয়াছিল। সারদাচরণ প্রাচীন কবিগণের বড় ভক্ত; বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির ললিত মধুর পদাবলী তাঁহার হৃদয়ে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, তিনি বহু অর্থব্যয়ে বিদ্যাপতির একখানি সটীক ও নির্ভুল পদাবলী সম্পাদন কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করেন। 'কায়স্থ কারিকা' নামক বঙ্গীয় কায়স্থ বংশাবলীর সম্পাদন ভারও তিনি গ্রহণ করেন। সারদাচরণের নির্ব্বাচিত একখানি আইনগ্রন্থ ও কয়েক খানি বিদ্যালয়-পাঠ্য-পুস্তক উল্লেখ যোগ্য। যে সকল গুণে মানবসমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হয়—সারদাচরণের হৃদয় সেই সকল গুণে অলঙ্কৃত; জন্মস্থানের প্রতি সারদাচরণের যেরূপ অনুরাগ লক্ষিত হয়, শিক্ষিত সমাজে তাহার তুলনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বগ্রামের উন্নতির জন্য তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন। পল্লীজীবনের মাধুর্য্য তিনি কোন দিনই বিস্মৃত হন না, তাই রাজধানীর সহস্র কার্য্যের মধ্যে যখন তিনি একটু অবসর পান, তখনই সেই স্নেহময়ী পল্লী জননীর ক্রোড়ে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হন।



শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ।

যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরা গ্রামে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে শিশিরকুমার ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম হরিনারায়ণ ঘোষ, জননী অমৃত দাসী। শিশিরকুমার হরিনারায়ণের মধ্যম পুত্র। শিশিরকুমার বাল্যকাল হইতেই বড় বুদ্ধিমান্। গ্রাম্য পাঠশালায় তিনি বাল্যকালে অতি সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ভগবান্ তাঁহার হৃদয় শিক্ষালাভের উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন, তাঁহার অধ্যবসায় ও প্রতিভার গুণে তিনি শিক্ষার পরিসর বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত বিবিধ গ্রন্থ পাঠে তিনি প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনে সমর্থ হন; প্রকৃতি স্নেহময়ী জননীর ন্যায় স্বয়ং শিশিরের শিক্ষাভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার বাল্যকাল হইতেই বলবান্ ও ব্যায়াম কুশল ছিলেন; কি সন্তরণ, কি অশ্বারোহণ, সকল ব্যায়ামেই তাঁহার অদ্ভুত নৈপুণ্য ছিল। শিশিরকুমারের চরিত্র নির্ম্মল, ভক্তিপ্রবল। সর্ব্ববিধ বাদ্যযন্ত্র বাদনে শিশিরকুমারের অসাধারণ কৃতিত্ব; তিনি যখন ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে সুধাময় কণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেন, তখন অতি পাষণ্ডের হৃদয়ও বিগলিত হইত। সঙ্গীত শাস্ত্রে শিশিরকুমার সুপণ্ডিত। শিশিরকুমারের সুনাম ও খ্যাতির প্রধান কারণ, সংবাদপত্র সম্পাদনে তাঁহার যোগ্যতা। বাঙ্গালী সম্পাদকগণের মধ্যে শিশিরকুমারের স্থান অতি উচ্চে। তরুণ বয়স হইতেই সংবাদপত্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ। ১৮৫৯ অব্দে যশোহরে নীল-বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। শিশিরকুমারের বয়স তখন সতের বৎসর মাত্র। সেই বয়সে স্বদেশবাসী হতভাগ্য কৃষককুলের দুর্দ্দশায় তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। শিশিরকুমার হিন্দুপেট্রিয়টে প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া নির্ভিকচিত্তে প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। শিশিরকুমার ভ্রাতৃগণের সহায়তায় মাগুরায় একটি ক্ষুদ্র ছাপাখানা স্থাপন করেন, এই ছাপাখানায় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশিত করেন, মায়ের নাম অনুসারে পত্রিকার নামকরণ হয়। মফস্বলের কাগজের মধ্যে অমৃতবাজারের মত আর কাহারও প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শিশিরকুমার কলিকাতায় আসিয়া ১৮৭২ অব্দে কলিকাতা হইতে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশে সমর্থ হইলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা অল্পদিনের মধ্যে বাঙ্গালী সমাজের মুখপত্র হইল, শিশিরকুমারের সুনাম দিকদিগে ঘোষিত হইল। দেশীয় রাজ্যসমূহে এখনও অমৃতবাজারের অটুট প্রতিষ্ঠা ও গৌরবের পরিচয় পাওয়া যায়। অতঃপর শিশিরকুমার রাজদ্বারেও যথেষ্ট সম্মানিত হইয়াছেন। তিনি দেশের হিতকর কার্য্যের সহিত কায়মনোবাক্যে যোগদান করিয়াছেন। বাঙ্গালী রাজনীতিজ্ঞগণের

মধ্যে শিশিরকুমার উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলোপের আইন বিধিবদ্ধ হইলে শিশিরকুমারের আন্তরিক যত্নে অমৃতবাজার বাঙ্গালা হইতে ইংরাজিতে রূপান্তরিত হয়। এই কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ তৎপরতা, বুদ্ধি-নৈপুণ্য ও সাহস পরিস্ফুট হইয়াছিল। প্রাচীন বয়সে শিশিরকুমার রাজনীতি চর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মচিন্তাতেই কালযাপন করিতেছেন, তিনি শ্রীচৈতন্য দেবের একজন ভক্ত সেবক। তাঁহার প্রণীত ভক্তি গ্রন্থসমূহে তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও ভগবদ্ভক্তি প্রকাশিত, তাঁহার প্রণীত কালাচাঁদ গীতা নামক কবিতা পূর্ণ ধর্ম্মগ্রন্থ খানি বঙ্গ সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। শিশিরকুমার ইংরাজী রচনায় সুপণ্ডিত। তাঁহার প্রণীত লর্ড গৌরাঙ্গ পৃথিবীর বহু স্থানে ধর্ম্মপিপাসু ভক্তগণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর সমক্ষে শিশিরকুমার আমাদের ভক্তি অবতার শ্রীচৈতন্যদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শিশিরকুমারের জীবন ধন্য। শিশিরকুমারের সম্পাদিত স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন নামক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-বিষয়ক পত্রিকাখানিও ইংলণ্ড এবং মার্কিণ ভূমিতে সমাদৃত হইয়াছে। অল্পদিন পূর্ব্বে শিশির-কুমার পত্নীশোক পাইয়াছেন। বার্দ্ধক্যে এই শোক দুঃসহ, কিন্তু ভগবান তাঁহাকে এই শোকে সান্ত্বনা দান করিবেন। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের ও ধর্ম্মের সেবা করুন।



KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন।

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র সেনের পূর্ব্বপুরুষগণ চট্টগ্রামের আদিম অধিবাসী নহেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে "রাঢ়ভঙ্গের" সময় শ্রীযুক্ত রায় নামীয় জনৈক ব্যক্তি ত্রিবেণীর অন্তর্গত কোন পল্লীগ্রাম হইতে পৈতৃক ভিটা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুদূর চট্টগ্রামে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপিত করেন। সেই অবধি বংশপরম্পরাক্রমে রায়বংশ চট্টগ্রাম প্রদেশে বাস করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রায় সৌভাগ্যগুণে চট্টগ্রামের রাজস্ব সচিবের ভার প্রাপ্ত হন। তিনি বিশুদ্ধাচারী হিন্দু ও একজন সিদ্ধ দুর্গাভক্ত ছিলেন। কথিত আছে তাঁহার অর্চ্চনায় প্রীত হইয়া তাঁহার ইষ্টদেবী মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দর্শন দান করিতেন। তাঁহার স্থাপিত দশভুজা মূর্ত্তি আজও চট্টগ্রামে রহিয়াছে। আজও তাঁহার বংশধরগণের নিকট কুলদেবতা-রূপে তিনি পূজা পাইতেছেন। শ্রীযুক্ত রায়ের বংশধরগণ নয় পুরুষ চট্টগ্রামে বাস করিতেছেন। নবাব প্রদত্ত শ্রীযুক্ত রায়ের জমীদারী আজিও নবীন বাবুরা অংশক্রমে উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। ১৭৬৮ শকাব্দা, ২৯শে মাঘ বুধবার চট্টগ্রামস্থ রাউজান থানার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ নয়াপাড়া গ্রামে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। নবীন বাবুর পিতা ৺ গোপীমোহন রায় * চট্টগ্রামের জজ আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন; পরে মুন্সেফ হন। তাঁহার দানশীলতা ও পরোপকারিতা দেশবিখ্যাত; আজও চট্টগ্রামে গৃহে গৃহে তাঁহার দানশীলতার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মুন্সেফীতে তাঁহার ব্যয় সংকুলান হইত না, অর্থের অভাব তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অনুভব করিতে হইত, তাই অবশেষে তিনি চট্টগ্রামের জজ আদালতের উকীল হন। নবীন বাবুর চট্টগ্রামের গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ হয়। বাল্যে নবীন চন্দ্র বিশেষ দুর্দান্ত ছিলেন,—তাঁহার দুষ্টামিতে তাঁহার সমাধ্যায়িগণ এমন কি তাঁহার শিক্ষকগণ পর্য্যন্তও অস্থির হইয়া উঠিতেন। তাঁহার কোন শিক্ষক বলিতেন—'গোপীবাবু নিশ্চয়ই মাঘমাসের শীতে এক গলা জলে দাঁড়াইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন—নহিলে এমন পুত্র পান!'—নবীন বাবুর দুষ্টামির পরিচয় ইহাতেই সকলের নিকট প্রতিভাত হইবে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নবীন বাবুর প্রতিভা ক্রমশঃ উন্মেষিত হইতে লাগিল। চট্টগ্রাম স্কুল হইতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় আসেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ্ এ পাস করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৮৬৭ সালে বি, এ পরীক্ষার তিন মাস পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন। নবীন বাবুর এখন হইতে একটি বৃহৎ সংসারের সমুদয় ভার তাঁহার উপরে পড়িল। পরবৎসর ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নবীন বাবু

---

* ইঁহাদের বংশের উপাধি রায় কিন্তু কোন বিশেষ কারণে নবীন বাবু 'রায়' উপাধি ত্যাগ করিয়া 'সেন' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জেনেরেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউসন হইতে বি, এ পাশ করিয়া ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শিপ পরীক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পিতার মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে প্রতিযোগী পরীক্ষার সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া নবীন বাবু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু পরের চাকুরী তাঁহার তেজস্বী জীবনের সঙ্গে ঠিক সঙ্গত নাই, তাই তাঁহার সমগ্র চাকুরী জীবনে উৰ্দ্ধতনকর্ম্মচারিগণের সহিত চিরদিন তাঁহার সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার সমগ্র চাকুরী জীবনে উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণের সহিত চিরদিন তাঁহার সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার বিবেকশক্তি তাঁহাকে যে পথ দেখাইয়া দিয়াছে—চির দিন তিনি সেই পথে গিয়াছেন এজন্য তাঁহাকে অনেক সময় অনেক বিপদ ও উৰ্দ্ধতন রাজ-পুরুষ দিগের ভ্রূকুটী ও অসন্তোষ সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু কোন দিকে তিনি দৃকপাত করেন নাই। তাঁহার চরিত্রের তেজস্বীতা, তাঁহার মনের দৃঢ়তা এবং তাঁহার অদম্য সাহস তাঁহার স্বদেশবাসী এবং অনেক শ্বেতাঙ্গপুরুষের হৃদয়ে তাঁহাকে উচ্চ আসন দিয়াছে। ন্যায়পরতা এবং পরোপকারিতা তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার যেখানে যেখানে তিনি শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিলেন সেই সব প্রদেশে কোন না কোন হিতকর কার্য্যে তাঁহার উন্নত হৃদয়ের পরিচয় রাখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু যে জন্য নবীনচন্দ্র আজ দেশবিখ্যাত, বাল্যজীবনে তাঁহার সে প্রতিভার পরিচয় আমরা পাই না। তিনিও জগতের কাছে সে সময় তাহার কোন পরিচয় দেন নাই। কিন্তু চট্টগ্রামের মধুর পার্ব্বত্য শোভা,—সর্ব্বোপরি তাহার জন্মস্থান নওয়াপাড়ায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বাল্যজীবনেই অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয়ে যে সৌন্দর্য্যের কবিত্বের বীজ বপন করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই! অবকাশরঞ্জিনী প্রথম ভাগে আমরা সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার কবিত্বের পরিচয় পাই। সংসারানভিজ্ঞ পিতৃহীন যুবকের হৃদয় ইহার স্তরে স্তরে প্রতিফলিত। কবি তাঁহার নিজের জীবনী ইহাতে অঙ্কিত করিয়াছেন,—তাই ইহা এত মর্ম্মস্পর্শী। তাহার পর ক্রমশই তাহার প্রতিভার উন্মেষিত হইতে লাগিল। তাহার পরই আমরা অবকাশরঞ্জিনী দ্বিতীয় ভাগ পাই। তাহার পর ক্রমান্বয়ে পলাশির যুদ্ধ; রঙ্গমতী; রৈবতক; কুরুক্ষেত্র; প্রভাস; অমিতাভ; ভানুমতী; গীতা; চণ্ডী; খৃষ্ট; প্রবাসের পত্র প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্য পুষ্ট ও উন্নত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার প্রদত্ত রত্নসমূহ চিরদিন বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে উজ্জ্বল হইয়া রহিবে।

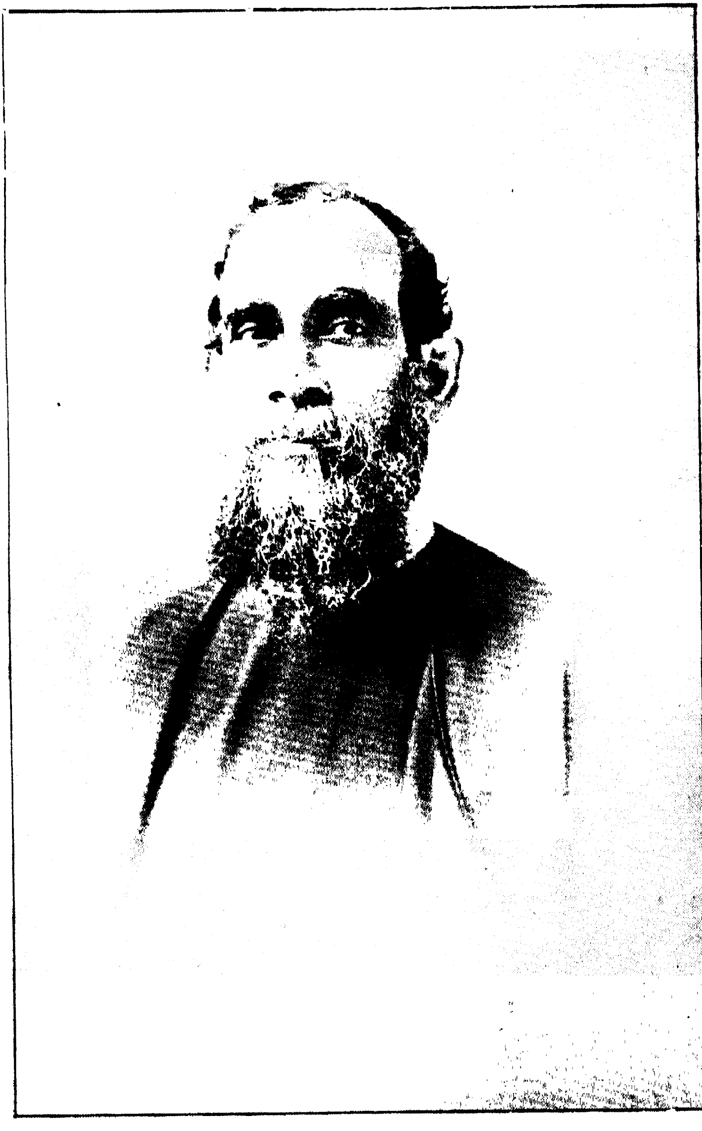


KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী।

চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী মজিলপুর গ্রামে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত হরানন্দ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাসাগর। হরানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্যতম বন্ধু। শাস্ত্রী মহাশয়ের জননী শ্রীমতী গোলকমণি দেবী সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহোদরা। শৈশবকালেই শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতৃবন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সংসর্গ লাভ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় সুপণ্ডিত কর্ম্মঠ ও ন্যায়নিষ্ঠ পিতা এবং মাতুল মহাশয়ের চরিত্রের প্রভাব তাঁহার জীবনে সংক্রামিত হইয়াছিল। শৈশবে স্বীয় গ্রামস্থ পাঠশালা ও স্কুলে বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। কিছুকাল নিজ হস্তে রন্ধন কার্য্য ও কোন কোন গৃহস্থের বাড়ীতে ঠাকুর পূজা করিয়া অতি কষ্টে তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইয়াছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয় আচার্য্য কেশব চন্দ্রের নিকট তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন, পাঠ্যাবস্থায়ই সমাজ সংস্কার কার্য্যে তাঁহার প্রবল উৎসাহ জন্মিয়াছিল, ইহাতে পড়াশুনার যথেষ্ট ক্ষতিও হইয়াছিল। তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে অতি যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃতে এম, এ, পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করিয়া শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মাতুলের অভিপ্রায় অনুসারে তৎপ্রতিষ্ঠিত হরিনাভি এণ্ট্রান্স স্কুলের সেক্রেটারী ও হেডমাষ্টার হইয়া হরিনাভি গমন করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীপুর সাউথ সুবার্ব্বন স্কুলের হেড মাষ্টার নিযুক্ত হন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে হেয়ার স্কুলের হেড পণ্ডিত ও অনুবাদ শিক্ষক নিযুক্ত হন। উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে এত দিনে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের পদলাভ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় উচ্চ পেন্সন ভোগ করিতে পারিতেন। কিন্তু পাঠ্যাবস্থায় প্রাণে যে ধর্ম্মের আগুণ জাগিয়াছিল, ক্রমে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাকে ঈশ্বর সেবায় আকর্ষণ করিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ব্রতগ্রহণ করেন। তদবধি এই মনস্বী স্বাধীনচেতা ধর্ম্মপ্রাণ পুরুষ দরিদ্রতাকে চিরজীবনের জন্য বরণ করিয়া লইয়া ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতাদিগের অন্যতম নেতা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের খ্যাতনামা বহু সভ্য ইহাঁর শিষ্যস্থানীয়। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র এবং ইংলণ্ডেরও কোন কোন স্থানে ভ্রমণ করিয়া ইনি প্রবল উৎসাহ সহকারে স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র প্রভাবে ও বাগ্মিতা শক্তিতে বহু লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে তিনিই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান নেতা। বাংলা ভাষায় শাস্ত্রী মহাশয় বহু গ্রন্থ রচনা করি-

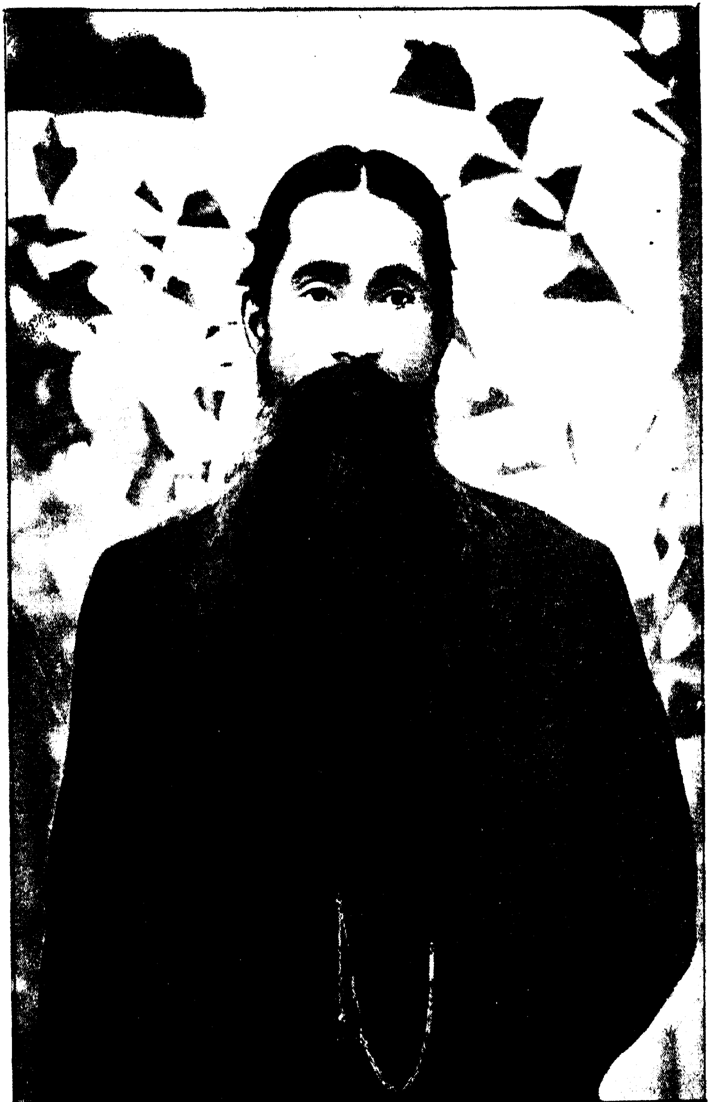
য়াছেন। তিনি একজন সুকবি। অতি অল্প বয়সে ছাত্রাবস্থায় তিনি "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন এবং তাহা বিদ্যালয়ে পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হয়। সে সময় তিনি পথে বাহির হইলে সেই কবিকে দেখিবার জন্য ছাত্রমণ্ডলী দলে দলে রাস্তায় দণ্ডায়মান হইত। তাঁহার রচিত "পুষ্পমালা" "মেজ বউ" "যুগান্তর" "নয়নতারা" প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গ সাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। তাঁহার আধ্যাত্মিক উপাসনাবলী ও কবিতাবলী বহু তাপিত ও তৃষিত আত্মাকে শান্তি ও নিরাশ আত্মাকে বল দান করিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় চিরদিনই স্বাধীনচেতা পুরুষ বলিয়া পরিচিত। সংসারে ধনবানের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার ব্রত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার চিত্তে এই স্বাধীনভাবের বিকাশ হইয়াছিল। ছাত্রাবস্থায় তিনি এক বার পীড়িত হইলে স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় জনৈক ভদ্রলোকের অনুরোধে বিনা পয়সায় তাঁহার চিকিৎসা করিতে ছিলেন। ডাক্তার সরকার শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্মুখে একটী ভদ্রলোককে অযথা কতকগুলি কটূক্তি করেন। শাস্ত্রী মহাশয় এই অন্যায় কটূক্তির জন্য ডাক্তার সরকারকে তীব্র ভাষায় এক পত্র লিখিলেন। ডাক্তার সরকার স্বয়ং স্বাধীনচেতা মহৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন, এই পত্র পড়িয়া তিনি যুবকের স্বাধীনচিত্ততা ও স্পষ্টবাদিতায় পরম প্রীত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন। সেই এক ভর্ৎসনা চিঠিতে উভয়ের মধ্যে চিরদিনের জন্য অকৃত্রিম বন্ধুতা স্থাপিত হইয়া গেল। পাঠ্যাবস্থায়ই ১৭ বৎসর বয়সে চটীজুতা পায়ে দিয়া একদিন তিনি তাঁহার পিতার কোন কার্য্য উপলক্ষে তদানীন্তন স্কুল ইনস্পেক্টর ক্রফোর্ড সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব তাঁহাকে চটীজুতা বাহিরে রাখিয়া আসিতে বলিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, চটী তিনি পা হইতে খুলিবেন না। সাহেব বলিলেন, তোমাকে চটী খুলিতেই হইবে, তিনি বলিলেন তিনি কছুতেই খুলিবেন না। সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ীতে গেলে তিনি চটী খুলিয়া বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিবেন কি না? শাস্ত্রী মহাশয় উত্তর করিলেন সেখানে যে ফরাস পাতা থাকে। সাহেব উত্তর করিলেন, যুক্তি তর্ক বুঝি না বল হাঁ কি না। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "হাঁ সাহেব, সেখানে চটী খুলিব।" দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভাগিনেয়ের এই স্বাধীনচিত্ততার সংবাদ শুনিয়া পরদিন "ক্রফোর্ড সাহেব ও চটীজুতা" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে শাস্ত্রী মহাশয় এককালে এই দেশের অগ্রণীদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। এখন প্রধান ভাবে ধর্ম্মভার নিয়াই ব্যস্ত থাকেন রাজনীতি বিষয়ে তিনি উন্নতিশীল দলভুক্ত। জাতীয় উন্নতি বিষয়ে তিনি সর্ব্বদাই প্রবন্ধ ও বক্তৃতা দ্বারা স্বীয় মত প্রচার করিয়া থাকেন। দেশের উন্নতির চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক। স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্ব্বাবধি তিনি দেশীয় বস্ত্র প্রচারে আবশ্যক সম্বন্ধে ভারতবর্ষের নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন, তিনি নিজে বহুকাল হইতে স্বদেশী বস্ত্রই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার মত ধর্ম্মপরায়ণ স্বাধীনচেতা, পরদুঃখকাতর চরিত্রবান পুরুষ বঙ্গদেশে বিরল। তিনি এখনও নানাপ্রকারে যুবকের ন্যায় উৎসাহে দেশের হিতসাধন করিতেছেন।



শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয় এবং কলিকাতার তালতলা ভবনেই তাঁহার শৈশব-কাল অতিবাহিত হয়। সুরেন্দ্রনাথের পিতা স্বর্গীয় ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। সুরেন্দ্র বাবু যদিও ভারতবর্ষে যশে ও প্রতিষ্ঠায় অগ্রগণ্য, তথাপি এখনও মফঃস্বলের সুদূরপল্লীস্থ বয়োবৃদ্ধগণের কাছে, সুরেন্দ্র বাবু অপেক্ষা তাঁহার ধন্বন্তরিকল্প পিতাই অধিক পরিচিত। ডাক্তার দুর্গাচরণ যেরূপ বিচিত্র কৌশলে রোগের নিদান নির্ণয় ও আরোগ্যবিধান করিতেন, তৎসম্বন্ধে শত শত গল্প বাঙ্গালার সর্ব্ব স্থানে প্রচলিত আছে। বাল্যকালে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতার ডভটন কলেজে অধ্যয়ন করেন। ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় বালক যুবকদিগের জন্যই এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং অতি-ভাগ্যবান্ ভারত সন্তানেরাই এই কলেজে পড়িতে পাইতেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় সুরেন্দ্রনাথ প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন ; ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বি, এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া সিভিল সার্ভিস-পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি বিলাতযাত্রা করেন। বিলাতে সুরেন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণের সাহায্য পাইয়াছিলেন। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকার এবং অধ্যাপক সেমুয়েল মোরলি ইঁহার শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন ; কিন্তু পরীক্ষার কার্য্যনির্ব্বাহক কমিশনারগণ বলিলেন, সুরেন্দ্র বাবু নির্দ্দিষ্ট বয়স অতিক্রম করিয়াছেন। এই অছিলা ধরিয়া তাঁহারা তালিকা হইতে সুরেন্দ্রনাথের নাম উঠাইয়া দিবার জন্যই সংকল্প করিলেন। এই বিপদে পড়িয়া সুরেন্দ্রনাথ বৃটীশ বিচারালয়ে কমিশনরগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন। বিচারকগণ, সুরেন্দ্র বাবুর অভিযোগ সঙ্গত মনে করিয়া, কমিশনরগণের অন্যায় সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য রুল জারি করেন। কমিশরগণ আর বাড়াবাড়ি না করিয়া, সুরেন্দ্র বাবুকে সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করিয়া দেন। সুরেন্দ্রনাথ সিভিলিয়ান হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন এবং দুই বৎসরকাল শ্রীহট্টে এসিষ্টাণ্ট-মাজিষ্ট্রেটের পদে কার্য্য করেন ; কিন্তু দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই তাঁহাকে বিপদে পড়িতে হয় ; ফেরারী আসামী সম্বন্ধে অন্যায় আদেশ প্রদান ও অন্যায়রূপ রিপোর্ট করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে অভিযুক্ত হইতে হয়। এই অভিযোগের বিচার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েক দিন অনুসন্ধানাদির পর কমিশন এক রিপোর্টে দেখাইলেন, "সুরেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধে যে চৌদ্দটী অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটী সত্য।" গভর্ণমেণ্টও কমিশনের মতে মত করিয়া সুরেন্দ্র বাবুকে ৫০৲ টাকার নামমাত্র মাসিক বৃত্তি প্রদান করিয়া, কর্ম্মচ্যুত করিলেন। সুরেন্দ্র বাবু বলিয়াছিলেন, "আমি জ্ঞানকৃত কোনরূপ অপরাধ করি নাই ; আদেশপত্র সেরেস্তায় লিখিত হইয়া অপরাপর অনেক আদেশপত্রাদির সহিত স্বাক্ষরার্থ আমার সম্মুখে নীত হইয়াছিল। আমিও তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিয়া, তাহাতেই দস্তখত করিয়া দিয়াছিলাম।" এ কৈফিয়ৎ কিন্তু গভর্ণমেণ্ট

গ্রাহ্য করেন নাই। ভারতীয় সংবাদপত্রে সুরেন্দ্র বাবুর নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ঘোরতর আন্দোলন চলিয়াছিল। বস্তুতঃ সুরেন্দ্র বাবুর জন্য এই সময়ে দূরতম পল্লীতেও যে সহানুভূতি ও আন্দোলনের তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, বৃটীশ ভারতের ইতিহাসে তাহা স্মরণীয়। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে এইরূপে অপসৃত হইয়া, সুরেন্দ্র বাবু দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের নিকটে যে প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন,—তাহাতে তাঁহার সেই পদত্যাগ দুর্ভাগ্যের বিষয় মনে না করিয়া, সকলেই পরম কল্যাণের সোপান বলিয়া মনে করিলেন। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রপলিটান কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকতা করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মেট্রপলিটান কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ইনি ফ্রিচর্চ্চ কলেজের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইনি স্বাধীন ভাবে কলিকাতা পটলডাঙ্গার একটি ক্ষুদ্র স্কুলের ভারগ্রহণ করেন। সেই ক্ষুদ্র স্কুলই সুপ্রসিদ্ধ রিপণ কলেজে পরিণত হইয়াছে। ইহার কয়েকটি শাখা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে সুরেন্দ্রনাথ "বেঙ্গলী" পত্রিকার সম্পাদন ও পরিচালন করিতেছেন। এখন ইহা দৈনিকে পরিণত হইয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অসামান্য প্রতিপত্তি-লাভ করিয়াছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের নবীন বিচারপতি নরিশ সাহেব একটা মামলা উপলক্ষে সর্ব্বহিন্দুর পূজ্য শালগ্রাম-শিলারূপী সাক্ষাৎ নারায়ণ দেবকে সাক্ষিরূপে খৃষ্টান মুসলমানে পরিপূরিত আদালত গৃহে আনিয়া সমগ্র হিন্দু-সমাজের হৃদয়ে আঘাত করেন। এই জন্যই তিনি সুরেন্দ্র বাবুর বেঙ্গলি পত্রেও তীব্র ভাষায় সমালোচিত ও নিন্দিত হন। সুরেন্দ্র বাবু এই জন্য আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। সুরেন্দ্র বাবু ত্রুটি স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমা-প্রার্থনা করিলেও, জজ নরিশ তাঁহাকে দুই মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ইতিপূর্ব্বে সুরেন্দ্রবাবু বক্তৃতা করিয়া দেশের সর্ব্বত্র অদ্বিতীয় বক্তা বলিয়া প্রথিত হইয়াছিলেন। এই কারাবাস উপলক্ষে তিনি সমগ্র ভারতের সর্ব্বত্র, আবাল বৃদ্ধ সকলের পরিচিত হইলেন। এই সময়ে দেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব্বস্থানে তাঁহার প্রতি যেরূপ সহানুভূতি প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার উদাহরণ এদেশে একান্ত বিরল। ইতিপূর্ব্বে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে "ইণ্ডিয়ান-এসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, ইনি যেরূপ উদ্যম ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অনন্যসাধারণ। কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে ইনি অন্যতম ও প্রধানতম। সুরেন্দ্রবাবু ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে যেরূপ পরিচিত, অধুনা অন্য কোন বাঙ্গালী সেরূপ পরিচিত হইবার মত সৌভাগ্যলাভ করেন নাই। তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মপটুতা এবং নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতা সর্ব্বত্র পরিচিত। স্বদেশহিতের জন্য সুরেন্দ্র বাবু যাহা করিয়াছেন—এখনও করিতেছেন, তাহা বস্তুতই বিস্ময়কর। ব্যবস্থাপক সভায় এবং মিউনিসিপাল সভায় ইনি স্বদেশহিতের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা অল্প লোকেই করিতে পারেন। প্রবীণ সুরেন্দ্রনাথ এখনও নবীনের মত কার্য্যদক্ষতা ও উদ্যমশীলতার পরিচয় দিতেছেন। সুরেন্দ্র বাবু ভারতের জাতীয় মহাসভায় দুইবার সভাপতি পদ পরিশোভিত করিয়াছেন। আমাদের দেশে অধুনা রাজনীতির আন্দোলনের যে নূতন স্রোত চলিতেছে, সুরেন্দ্রনাথই তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা। স্বদেশী আন্দোলনে সুরেন্দ্র বাবুর নিঃস্বার্থ কর্ম্মানুরাগ সমস্ত ভারতবর্ষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে।



স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

উমেশচন্দ্র ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে খিদিরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। উমেশচন্দ্রের পিতামহ খিদিরপুর ও কলিকাতায় অনেক ভূমি সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া, প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার মাতা ত্রিবেণীর সুপ্রসিদ্ধ ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বংশে জন্মিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা হাইকোর্টের প্রধান এটর্ণি ছিলেন। বাল্যকালে উমেশচন্দ্র লেখাপড়ার প্রতি তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না;—অভিনয়াদি দেখিয়া বেড়াইতেন; সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ ও মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে যে অভিনয় হইত, তাহাতে তিনি অভিনয় করিতেন। কিন্তু বাল্যকালেই শারীরিক সৌন্দর্য্য ও সরল মধুর ব্যবহারে ইনি সর্ব্বত্র প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। উমেশচন্দ্রের পিতা যখন দেখিলেন, বালকের পড়া শুনায় মন নাই, তখন হতাশ হইয়া তাঁহাকে হাইকোর্টের এটর্ণি শ্রীযুক্ত ডবলিউ, পি ডাউনিং সাহেবের কেরাণী করিয়া দিলেন, এবং কিছুদিন পরে তাঁহাকে মিঃ গিলেভারের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এই সময় হইতেই কিন্তু উমেশের জীবনে বিচিত্র পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইল। তিনি মনোযোগপূর্ব্বক আইন-শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে তাহাতে এতদূর পারদর্শিতা লাভ করিলেন যে, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে রস্তমজি জেমসেটজি জিজিভাই নামক প্রসিদ্ধ পারসীক কুবেরের প্রদত্ত বৃত্তি পাইয়া, আইন পড়িবার জন্য বিলাতযাত্রা করিলেন;—এই বৃত্তি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বিলাতে উমেশচন্দ্র সুপ্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ মিঃ টি, এচ, ডার্ট এবং মিঃ এডওয়ার্ড ফ্রাই প্রভৃতি মহোদয়ের নিকট আইন শিখিতে লাগিলেন,—যথাকালে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া, হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার অপূর্ব্ব শিক্ষা ও প্রতিভার ফল দেশমধ্যে প্রচারিত হইল এবং তিনি ব্যবহারাজীবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেন। ক্রমে তাঁহার প্রতিষ্ঠার এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, তিনি কয়েকবার ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সুলি বা সরকারী ব্যারিষ্টার পদে নিযুক্ত হন। উমেশচন্দ্র দুইবার হাইকোর্টের জজিয়তি গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু দুইবারই তিনি উক্ত পদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ব্যবহারাজীব-কার্য্যেও তিনি অনেকবার দেশের উপকারে স্বীয় অসাধারণ শক্তিবিনিয়োগ করিয়া—দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের আদালত-অবজ্ঞার মোকদ্দমায়, এবং ষ্টেটস্‌ম্যান-সম্পাদক রবার্ট নাইটের মোকদ্দমায়—উমেশচন্দ্র যেরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও প্রবল যুক্তির সহিত আদালতে প্রতিবাদিপক্ষের সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। "বেঙ্গলী পত্রিকা" যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহাদের মধ্যে উমেশ-চন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। শিমলার ঘোষ-বংশধর বিদ্বৎকুলতিলক গিরিশচন্দ্র ঘোষই বেঙ্গলীর সম্পাদক পদে থাকিয়া দেশবিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু উমেশচন্দ্র যে, বেঙ্গলীর প্রতিষ্ঠাতৃপুরস্কারে বিখ্যাত হইবার উপযুক্ত, তাহা সকলের জানা উচিত। ইনি যখন বিলাতে ছাত্রাবস্থায় ছিলেন, তখন "লণ্ডন-ইণ্ডিয়ান সোসাইটি" নামক সভা স্থাপন

করিয়া ভারতীয় বিষয় সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি,—"ভারতবর্ষের জন্য নির্ব্বাচনপ্রথা ও গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন "ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস" বা ভারতীয়-মহাসমিতির প্রতিষ্ঠা পক্ষে ইনি যে, ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন, সেই প্রাণপণ যত্ন চেষ্টা ইঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। এই মহা-সমিতির যতগুলি অধিবেশন হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটীতেই ইনি অন্তরের সহিত যোগদান করিয়া, স্বীয় প্রগাঢ় স্বদেশভক্তির মর্য্যাদা-রক্ষা করিয়াছিলেন। উৎসাহের মূর্ত্তিমান্ অবতার স্বদেশের সুসন্তান, প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত অযোধ্যানাথ যখন সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন মহাসমিতির গুরুতর সম্পাদকীয় কার্য্যের জন্য সকলের দৃষ্টি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপরই পতিত হইয়াছিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইনি কংগ্রেসের সম্পাদকপদ গ্রহণ করেন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায়, উমেশচন্দ্র ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বিলাত গমন করেন, এবং শ্রীযুক্ত দাদাভাই নরোজি এবং মিঃ ডিগ্‌বির সহযোগে সেখানে একটি রাজনৈতিক সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ইংলণ্ডবাসীদিগের সম্মুখে ভারতীয় অবস্থা সর্ব্বদা প্রতিফলিত রাখাই এই সভার উদ্দেশ্য। এতদ্ভিন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিলাতের নানা স্থানে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানাবিধ বক্তৃতা করেন। ওয়েনসিট নামক স্থানে, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে, ইনি "ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে ভারতবাসীর রাজভক্তি সম্বন্ধে আশ্বস্ত করিয়া শ্রোতা ইংরেজদিগকে, ইনি গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব ও কংগ্রেসের কার্য্যের উদ্দেশ্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। ঐ বর্ষের ২১শে আগষ্ট বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নর্দ্দমটনের টাউন-হলে "আমাদের অভাব ও অভিযোগ" সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর ইনি ক্রয়ডন নগরের ললনা সভায় "ভারত সংস্কার" সম্বন্ধে আর একটী বক্তৃতা করেন; তাহাতে সমবেত শ্রোতৃবর্গ সবিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইংরেজ ও বাঙ্গালী উভয় শ্রেণীরই প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ভীকতা সত্যপ্রিয়তা প্রভৃতি গুণ অনুকরণযোগ্য। শেষাবস্থায় স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায়, এ দেশের জল বায়ু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহ্য হয় না, তাই তিনি সপরিবারে বিলাতে—লণ্ডন নগরের উপকূলস্থ স্বকীয় ক্রয়ডন ভবনের "খিদিরপুর ভিলায়" কালযাপন করিতেছিলেন। শরীর সহসা একান্ত অপটু হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই, তিনি পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করিতে পান নাই। কিন্তু স্বাস্থ্যলাভ করিয়া আবার প্রিভি কাউন্সিলে কাজ করিতেছিলেন। সহসা তাঁহাকে কালহস্তে পড়িতে হইল। ১৯০৬ অব্দের ১৯শে জুলাই, তিনি বিলাতের ক্রয়ডন-ধামে, ভারতকে কাঁদাইয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মত অদ্বিতীয় ভারত-সন্তান একান্ত দুর্লভ।



স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ।

মনোমোহন ঘোষের পিতা রামলোচন ঘোষ, বড়লাট লর্ড অকলণ্ডের সময়ে, সদর-আলার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুরান্তর্গত বৈরলদি গ্রাম। রামলোচন ঘোষ রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহারই মত সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। ঢাকা কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে রামলোচনের নাম অগ্রগণ্য; এই কলেজের জন্য তিনি যথেষ্ট অর্থসাহায্যও করিয়াছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বৈরলদি গ্রামে মনোমোহনের জন্ম হয়। কিন্তু মনোমোহন বাল্যকালে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু এদেশে আর অধিক দিন না থাকিয়া, মনোমোহন ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে, সিভিল-সার্ব্বিস্ পরীক্ষা দিবার জন্য, বিলাত যান। ইহাঁরাই ভারতীয় যুবকদিগের সিভিল পরীক্ষা সম্বন্ধে পথ-প্রদর্শক বলিয়া পরিচিত হন। পরীক্ষায় পথপ্রদর্শক হইয়াও কিন্তু মনোমোহন সহচর সত্যেন্দ্রনাথের ন্যায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; তাঁহাকে ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। এখানে ব্যারিষ্টারী উপলক্ষেও তাঁহাকে প্রথমে নানারূপ কষ্ট ও অসুবিধাভোগ করিতে হইয়াছিল। এখানকার কোন বৃটীশ বা আইরিষ ব্যারিষ্টারের নিকট হইতেই তিনি কোনরূপ সাহায্য বা সহানুভূতি পান নাই। কিন্তু, প্রকৃত গুণ কেহ চাপিয়া রাখিতে পারে না। ব্যারিষ্টারীতে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি শীঘ্রই প্রচারিত হইয়া পড়িল। ঘটনাক্রমে এই সময়ে একটী মোকদ্দমা উপস্থিত হয়; মনোমোহনও এই মোকদ্দমায় বাদী আমীরুদ্দীনের পক্ষ অবলম্বন করেন। প্রতিবাদী-গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বড় বড় বৃটীশ ব্যারিষ্টার দণ্ডায়মান হন। এই বিচারযুদ্ধে মনোমোহনের ব্যবহার-শাস্ত্রাধিকার দেখিয়া ও তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া, জষ্টিস্ নর্ম্মাণ তাঁহার প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদুক্তি করেন, তাহা অনতিবিলম্বেই সত্যে পরিণত হয়; মনোমোহন ব্যারিষ্টার সম্প্রদায়ের উজ্জ্বল মুখ আরও উজ্জ্বল করেন। কিন্তু ব্যারিষ্টারীতে প্রসার বৃদ্ধি করিয়া ধনকুবের হওয়াই মনোমোহনের অভিপ্রেত ছিল না। তিনি যে, ঐকান্তিক স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিবাৎসল্যে অভিভূত ছিলেন, তাহা স্বীয় কর্ম্মজীবনের স্তরে স্তরে সুবর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। যেখানে পুলিসের অত্যাচারে বা বিচারবিভ্রাটে দুর্ব্বল ভারত-সন্তান নিপীড়িত হইয়াছে, মনোমোহন সেখানে বিপদ্‌ভঞ্জন মহাপুরুষের ন্যায়, নিঃস্বার্থভাবে নিপীড়িতের নিস্তার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কত দরিদ্র হতভাগ্যকে যে, তিনি ভীষণ প্রাণদণ্ড হইতে বাঁচাইয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না; এ দেশের গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, দ্বারে দ্বারে সেই সকল ঘটনা প্রবচনপ্রবাদে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে;—১৮৮২ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার মুলুকচাঁদ নামে এক হতভাগ্যকে পুলিস বিচারালয়ে উপস্থিত করে। অভিযোগে পুলিস বলে, মুলুকচাঁদ নিজের নবমবর্ষীয়া কন্যা নেকজানকে নিজে হত্যা করিয়াছে।

পুলিসের শিক্ষায় ও ভয়ে নেকজানের সহোদরা ও গর্ভধারিণী মাতাও সাক্ষ্য দিয়া বলে যে, "মুলুকচাঁদকে কন্যাহত্যা করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি।" নিজের কন্যা ও স্ত্রী যখন মুলুকের বিরুদ্ধে এইরূপ প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিল, তখন জজ সাহেব যে, তাঁহার ফাঁসির হুকুম দিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু নথাপত্র পড়িয়া যখন মনোমোহন বুঝিলেন, বেচারী বাস্তবিক নির্দ্দোষী, কেবল পুলিসের ষড়যন্ত্রে এরূপ অঘটন ঘটিয়াছে, তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই, মুলুকচাঁদের পক্ষসমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্যবহারশাস্ত্রবিশারদ মনোমোহনের সূক্ষ্মবুদ্ধিসুলভ গুপ্তসত্যনিষ্কাষণ-শক্তির গুণে মুলুকচাঁদ শেষে হাইকোর্টের বিচারে বেকসুর খালাস পাইল। যতদিন বাঁচিয়াছিল, ততদিন গরীব মুলুকচাঁদ প্রতিবৎসর দুই একবার কিছু উপহার লইয়া আসিয়া, স্বীয় প্রাণদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করিয়া যাইত। কিন্তু এরূপ প্রাণদানের এইরূপ উদাহরণ যথেষ্ট আছে। স্বভাবসরল ছাত্রসম্প্রদায়ের প্রতি মনোমোহনের সবিশেষ স্নেহ ও সহানুভূতি ছিল। ইহাদের উপর কোনরূপ উৎপীড়ন হইলে, মনোমোহন নিজের সহস্র স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া, ইহাদিগকে বিপন্মুক্ত করিতেন; এজন্য তিনি বস্তুতই প্রাণপণে যত্ন করিতেন। অত্যাচার-পীড়িত অসহায় হতভাগ্যের এমন বন্ধু আর মিলিবে না। হতভাগ্য টীকেন্দ্রজিৎকে প্রাণদণ্ড হইতে মুক্ত করিবার জন্য, মনোমোহন আবেদনে যে যুক্তিশক্তিপটুতা ও অপূর্ব্ব নজীর-জ্ঞানের পরিচয় দান করিয়াছিলেন, তাহাতে ল্যান্সডাউনের ন্যায় বড়লাট ও তাঁহার বড় অমাত্যদিগকেও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিতে হইয়াছিল। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন দেশের প্রায় প্রত্যেক সদনুষ্ঠানেই আগ্রহ সহকারে যোগ দিতেন। মনোমোহন ন্যাশ-ন্যাল কংগ্রেসের অদ্বিতীয় সুহৃৎ ছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কংগ্রেসে তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি-পদ পরিশোভিত করিয়াছিলেন। ফৌজদারি বিচারের অত্যাচারপথ সঙ্কুচিত করিতেই যেন মনোমোহন ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্যবহার-বিদ্যা-বৃহস্পতি ব্যারিষ্টার মনোমোহন কুবিচারকদিগের একপ্রকার শাসনকর্ত্তা বলিয়াই পরিচিত হইয়াছিলেন। অবিচার অত্যাচারের তাড়নে তাড়িত হইয়া, লোকে যদি মনোমোহনের শরণ লইতে পারিত, তাহা হই-লেই মনে করিত, এইবার নিস্তার পাইলাম। কেবল বিচারক ও বিচারের দোষ সংযত রাখিয়া এই মহাত্মা নিশ্চিন্ত হন নাই, শাসন ও বিচারের স্বাতন্ত্র্য বিধান-চেষ্টায় আত্মসমর্পণ করিয়া-ছিলেন। এই স্বাতন্ত্র্যের তিনি যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, কালে যে, গভর্ণমেণ্টকে সেই পথে চলিতে হইবে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। মনোমোহন কিন্তু কৃষ্ণনগরের স্বকীয় প্রাসাদে এই স্বাতন্ত্র্য-চিন্তার অভিভূত হইয়াই, সহসা লীলাসংবরণ করিয়াছিলেন; সত্যই তিনি স্বদেশের সেবায় নিজের প্রাণ বলি দিয়া গিয়াছেন।



শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ।

লালমোহন ঘোষ নদীয়া কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। লালমোহন কলিকাতায় শিক্ষালাভ করিয়া, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে, ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিবার জন্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃক বিলাতে প্রেরিত হন। ইহার অব্যবহিত পরেই পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া, লালমোহন ব্যারিষ্টারী করিবার জন্য, কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কয়েক বৎসর পরে, ইণ্ডিয়ান সিভিলসার্ব্বিস্‌-পরীক্ষা যাহাতে বিলাতের ন্যায় ভারতেও গৃহীত হয়, তাহার চেষ্টা ও আন্দোলনের জন্য, ইনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক, বিলাতে প্রেরিত হন। এই আন্দোলন উপলক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষে অসংখ্য সভাসমিতির অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে লালমোহন ঘোষ বিলাতে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা একান্ত বিফল হয় নাই। লালমোহনের বক্তৃতায় পার্লেমেণ্টের গণ্য মান্য সভ্যদিগকেও মুগ্ধ হইতে হইয়াছিল। অনতিপরেই ভারতেও ষ্টাটুটারী সিভিল-সার্ব্বিসের সৃষ্টি হইয়াছিল। তৎপরে লালমোহন অল্পদিন মাত্র বিলাতে ছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে তিনি, বার্মিংহাম নগরের চেম্বার অব্ কমার্স কর্ত্তৃক আহূত হইয়া, ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সম্বন্ধে একটী অতি সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলে, বোম্বাই ও কলিকাতার লোকে মহাসমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। এই সময়ে আদর্শ বড়লাট লর্ড রিপণের আদেশে, তাঁহার মহাচেতাঃ ব্যবস্থাসচিব ইলবার্ট সাহেব এ দেশের বিলাতী লোকদিগের উপর, বৃটীশ বিচারকদিগের ন্যায় দেশীয় বিচারকদিগকেও অবাধ বিচারাধিকার দিবার জন্য, ফৌজদারী আইনে নূতন ধারা সন্নিবেশিত করিতে চাহেন। এই নূতন বিধানের পাণ্ডুলিপিই "ইলবার্ট বিল" নামে পরিচিত হয়। এই ইলবার্ট-বিল লইয়া এদেশে তুমুল আন্দোলন চলিতে থাকে ; ফিরিঙ্গি ও সাহেবেরা ভারতবাসীর প্রতি ঘোর বিদ্বেষ দেখাইয়া, নানারূপ কুৎসা রটনা করেন এবং লর্ড রিপণের শত্রুতা করিতে বসিয়া, ভারতবাসীরও অনিষ্টসাধনকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এই সময়ে লালমোহন পুনরায় বিলাতে গমন করেন। ভারতের অধিবাসিগণের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম পার্লেমেণ্ট মহাসভার সভ্য হইবার জন্য চেষ্টা করেন। বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্যগুণে ইনি পূর্ব্বেই বিলাতের সর্ব্বত্র সমাদর-লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং যখন ডেটফোর্ড নগর হইতে ইনি সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার চেষ্টা করেন, তখন বহুসংখ্যক ইংরেজ ইহার দাবী অগ্রগণ্য মনে করিয়াছিলেন। সে সময়ে ইহার পক্ষ-সমর্থন করিবার জন্য তথাকার লোকেরা যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন,—তাহাতে ইহাঁর সফলতা একরূপ সুনিশ্চিত বলিয়া মনে হইয়াছিল। একটি বৃদ্ধ ইহাঁকে ভোট দিতে আসিয়া, অতিরিক্ত উৎসাহে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাঁর পক্ষে মোট ৩৫৬০ ভোট প্রদত্ত হইয়াছিল ; এবং আরও সহস্র সহস্র লোক এই ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু সহসা আইরিষদিগের চেষ্টায় লিবারেল সম্প্রদায়ের পরাভব হওয়াতে, মহাসভায় প্রবেশ করা ইহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠে। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে ফিন্সবেরি হইতে দাদা-

ভাই নরোজী মহাসভার জন্য মনোনীত হন। কিন্তু লালমোহনের প্রাথমিক চেষ্টা ও বিফলতার মধ্যেও যে সফলতার অঙ্কুর গুপ্ত ছিল, মিঃ নরোজী তাহারই ফলভোগ করিলেন, বলিয়াই মনে হয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লালমোহন বিলাতে গিয়া, বিখ্যাত বাগ্মী জন ব্রাইটের বন্ধুত্ব ও সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় সহানুভূতি লাভ করেন। লণ্ডনে লালমোহন যে দিন প্রথম বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সে দিন জন ব্রাইটই সভাপতি হইয়াছিলেন; সে দিন তাঁহার ওজস্বী কণ্ঠের অপূর্ব্ব বাগ্মিতা বিলাতের শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। জন ব্রাইটের মত অদ্বিতীয় বাগ্মীও সভার অবসানে বলিয়াছিলেন, এমন সুন্দর বক্তৃতার পর তাঁহার আর কিছু বলিবার নাই। ইলবার্ট-বিলের সময়ে কলিকাতায় ব্যারিষ্টার ব্রান্সন প্রভৃতি কতিপয় সাহেব বিলের বিপক্ষতা করিয়া, ভারতবাসীদিগকে কটূক্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতীয় সমস্ত সম্প্রদায় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে সময়ে লালমোহন ঘোষ ঢাকা নগরীর নর্থব্রুক হলে এতৎসম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। সেদিন ঝড় বৃষ্টি হইয়াছিল; তৎসত্বেও বিস্তর লোক বক্তৃতাস্থলে সমাগত হইয়াছিলেন। এই সভায় লালমোহন ঘোষ ব্রান্সনপ্রমুখ প্রতিপক্ষদলের নিন্দা ও কটূক্তির যে জবাব গাহিয়াছিলেন, তাহা অনন্যসাধারণ। তাঁহার যুক্তির সারবত্তা, ভাষার লালিত্য ও অপূর্ব্ব বাগ্মিতায় সকলকেই উত্তেজিত ও উৎসাহিত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতা পাণ্ডিত্য ও ওজস্বিতায় পূর্ণ, তাঁহার বিদ্রূপের ভঙ্গীতেও একটা অনন্যসাধারণত্বের ভাব থাকে। এজন্য তিনি কথনই চপল বা অসার হইয়া পড়েন না। ইউরোপীয় সাহিত্য ও ইতিহাসে লালমোহনের অসাধারণ অধিকার। তাঁহার লেখায়, তাঁহার কথাবার্ত্তায় অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বঙ্গভাষার একজন প্রকৃত অনুরাগী ও ভক্ত; মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের তিনি যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা মিণ্টনের ঝঙ্কারে প্রতিশব্দিত হইয়াছে। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে লালমোহন ঘোষ জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। লালমোহন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে বসিয়া ধীরতা, তেজস্বিতা ও রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া, প্রজাবর্গের ন্যায় রাজপুরুষবর্গেরও ভক্তিপ্রীতি উত্তেজিত করিয়াছিলেন। ইংরেজী বক্তৃতায় তিনি প্রকৃত বাগ্মী। লালমোহনের বক্তৃতা শুনিলে জন ব্রাইটকে মনে পড়ে। আমরাও তাঁহাকে বঙ্গের ব্রাইট বলিয়া মনে করি। বিলাতের রাজনৈতিক ইতিহাস লালমোহন ঘোষের নখদর্পণে বিরাজমান। তাঁহার মত রাজনীতিময়ী বক্তৃতা পার্লেমেণ্টের সভ্যদিগের কণ্ঠেও বিরল।



KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত সুবিখ্যাত সেন বংশে, ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী নরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। নরেন্দ্রনাথ মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র। তদানীন্তন সম্ভ্রান্ত-বংশীয় বালকদিগের রীতি অনুসারে তিনি "হিন্দুকলেজে" প্রবেশ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বিদ্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায় ষোড়শ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার কঠিন পীড়া হওয়ায় তাঁহাকে কলেজ পরিত্যাগ করিতে হয়। সেই অবধি গৃহশিক্ষকের সাহায্যে এবং নিজের যত্নে ও অনুরাগে নরেন্দ্রনাথ ক্রমশঃ সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি সংবাদপত্রে ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন এবং প্রত্যহ ৪।৫ ঘণ্টা "পাব্‌লিক লাইব্রেরীতে গিয়া নানাবিষয়ে পড়াশুনা করিতে থাকেন। এই সময়ে "ইনডিয়ান্ ফিল্ড্" পত্রে নিয়মিতরূপে লিখিতে থাকেন। প্রায় ২৩।২৪ বৎসর বয়সের সময় তিনি এটর্নীর কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে "মিরার্" পাক্ষিক পত্ররূপে প্রকাশিত হয়। তখন মহাত্মা মনোমোহন ঘোষ সম্পাদক এবং নরেন্দ্রনাথ তাঁহার সহযোগী নিযুক্ত হন। তদনন্তর কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র কিছুকাল সাপ্তাহিক মিরারের সম্পাদকতা করার পর, নরেন্দ্রনাথ তাহার সম্পাদক হন, এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম দৈনিক পত্ররূপে মিরারকে পরিবর্দ্ধিত করেন। সেই হইতে তিনি যোগ্যতার সহিত মিরারের সম্পাদকতা করিয়া আসিতেছেন। কি রাজদ্বারে কি জনসাধারণের মধ্যে নরেন্দ্রনাথের সম্মান সর্ব্বত্র। একজন সত্যপরায়ণ, ধর্ম্মভীরু, স্বাধীনচেতা লোক বলিয়া তাঁহার শত্রুকেও তাঁহার সম্মান করিতে হয়। গভর্ণমেণ্ট্ স্বয়ং অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার এবং অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ করিয়াছেন। তিনি একাধিকবার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কি মিউনিসিপালিটিতে কি ব্যবস্থাপক সভায়, সর্ব্বত্র, তিনি যাহা সত্য এবং যাহাতে দেশবাসীর কল্যাণ হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নির্ভীক হৃদয়ে যাহা বেশ বুঝিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন, বলিয়াছেন এবং করিয়াছেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে জাতীয় মহাসমিতির প্রথম অধিবেশনে বঙ্গদেশ হইতে তিন জন মাত্র প্রতিনিধি গমন করেন, নরেন্দ্রনাথ তাহাদের মধ্যে একজন। ইহার পূর্ব্বে কংগ্রেসসম্বন্ধে যে পূর্ব্বালোচনা হয়, তাহাতে নরেন্দ্রনাথ একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ যখন প্রথম মান্দ্রাজ যান, তখন সে প্রদেশে রাজনৈতিক বা সামাজিক কোনও প্রকার আন্দোলন ছিল না। তাঁহার উদ্যোগে ও সৎদৃষ্টান্তে মান্দ্রাজে সভাসমিতি ও সংবাদপত্র প্রকাশ পাইতে লাগিল। কি রাজনীতি, কি সমাজসংস্কার, কি স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার, কি পরোপকার, কি চরিত্র ও ধর্ম্মভাব সকল বিষয়েই তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া আছেন। ধর্ম্মমতে তিনি উদার হিন্দু। অথচ, বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ প্রভৃতি প্রথার বিরোধী এবং সকল ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের বন্ধু। তাঁহার সৎসাহসের ও স্বাধীন চিন্তার একটি দৃষ্টান্ত

দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় কংগ্রেসের পরে, "ভারতসভার পক্ষ্য হইতে লর্ড ডাফ্‌রিন্‌কে অভিনন্দন দিবার ব্যবস্থা হয়। সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন প্রভৃতি ৪০ জন সদস্যের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ একজন ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে নরেন্দ্রনাথ কোনও কোনও বিষয়ে বড়লাটের মতামতের সমালোচনা করিয়া মিরারেপ্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বড়লাট তাঁহাকে দেখিয়াই ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া, তাঁহার মতামত প্রকাশের কৈফিয়ৎ তলব করেন। নরেন্দ্রনাথ দুএকটীর শান্তভাবে তাঁর কথার উত্তর দেন; তাহাতে ডাফ্‌রিণ সাহেব আরও জোরের সহিত কৈফিয়ৎ চান; তখন নরেন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবে বলেন—"অমি আপনার গৃহে অভ্যাগত; এরূপ প্রশ্ন শোভনীয় নয়।" শেষে লাটসাহেবকে তজ্জন্য দুঃখপ্রকাশ করিতে হইয়াছিল। ইনি এখনও দেশের সেবায় লিপ্ত।



শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

রসায়নবিদ্যায় পারদর্শীতার জন্য ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাম জগদ্বিখ্যাত। সমালোচকগণ বলেন, যে ভারতীয় প্রতিভা পদার্থ-বিদ্যার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, যদি প্রফুল্লচন্দ্র দীর্ঘজীবন লাভ করেন, তবে এই অপবাদ দূরীভূত হইবে ইহা সুনিশ্চিত। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া রসায়নশাস্ত্রের কয়েকটি দুরূহ তত্ত্ব last links আবিষ্কার করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত তিনি ভারতবর্ষে একটি নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—এই কারখানা ভবিষ্যতে ভারতের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিবে এইরূপ আশা করা যায়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে খুলনা জেলার এক সামান্য গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বংশে প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম হয়। তদীয় পিতা শ্রীহরিশ্চন্দ্র রায় ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। স্বগ্রামে স্বীয় পিতৃদেবপ্রতিষ্ঠিত স্কুলে কিছুকাল অধ্যয়নের পর প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতা আগমন করেন। প্রথম কিছুদিন হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন করেন, পরে এলবার্ট স্কুলে যোগদান করেন। এই শেষোক্ত বিদ্যালয়ে, প্রফুল্লচন্দ্র স্বীয় শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন মহোদয়ের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। বিলাতে রসায়নবিদ্যা অধ্যয়নের সুবিধাকল্পে এই সময় তিনি লাটিন ও ফরাসি ভাষা শিক্ষা করেন। তদনন্তর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে গিলক্রাইষ্ট বৃত্তিলাভ করিয়া ইংলণ্ড গমন করেন। পুত্র বিলাতগমনের প্রস্তাব করিলে, প্রায়ই পিতামাতার নিকট হইতে আপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, প্রফুল্লচন্দ্রের পিতামাতা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত পুত্রের এই সাধুসংকল্পের সহায়তা করিয়াছিলেন। এডিনবরা-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া ছয় বর্ষ অধ্যয়নের পর প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ডি, এস্, সি, উপাধি লাভ করেন। রসায়নবিদ্যায় বিশেষভাবে মনোযোগ দিলেও, বিজ্ঞানের অপরাপর শাখাও তিনি অবহেলা করেন নাই—ডাক্তার উপাধি পাইবার কালে তিনি যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন সেই প্রবন্ধ আজিও Royal Society এর কার্য্য-বিবরণীর অঙ্গদেশ শোভা করিতেছে। বিলাতে অবস্থান কালেও স্বদেশের কথা সর্ব্বদা তাহার অন্তরে জাগরূক থাকিত। তিনি তৎকালে "ভারতবর্ষে সিপাহীবিদ্রোহের পর এবং পূর্ব্বে" নামধেয় একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন—এই প্রবন্ধে একাধারে তাঁহার স্বদেশনীতি ও শিক্ষা ফুটিয়া উঠিয়াছিল—সাধারণ্যে এই প্রবন্ধটির বিশেষ আদর হইয়াছিল—বিলাতের অনেক সুসন্তান সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকাসমূহে উক্ত রচনাটির সাদর-সমালোচনা করিয়াছিলেন। বিলাতে অবস্থানকালে প্রফুল্লচন্দ্র ইংরাজজাতির রাজনৈতিক জীবন পর্য্যালোচনা করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা কালে, তিনি ইউরোপের অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সমিতিতে স্বরচিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী প্রেরণ করিয়াছেন—এই প্রবন্ধগুলিতে প্রফুল্লচন্দ্রের, মৌলিকতা, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ও অসাধারণ মানসিক

শক্তির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। পারদসংক্রান্ত একাদশটি মিশ্র ধাতুর আবিষ্কার করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র রাসায়নিক সুধীগণকে বিস্মিত করিয়া দেন এবং পারদের রাসায়নিক তত্ত্বকে সম্পূর্ণ করেন। বর্ত্তমান স্বদেশী-আন্দোলনের বহুপূর্ব্বে ডাক্তার রায় প্রমুখ ভারতবর্ষের অনেক সুসন্তান বুঝিয়াছিলেন যে উপযুক্ত শিল্পবাণিজ্যের অভাবই ভারতবর্ষের দৈন্যের হেতু। বিশেষতঃ প্রফুল্লচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন জর্ম্মাণ রাজ্যের বর্ত্তমান উন্নতিবিধানের একতম হেতু রাসায়নিক-প্রক্রিয়াবলে ঔষধ, রং, সাবান প্রস্তুতকরণ। এইজন্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ এম্, এ, মহাশয়ের সহযোগে তিনি "Bengal Chemical and Pharmaceutical Works." নামধেয় রাসায়নিক ঔষধ প্রস্তুতাগার প্রতিষ্ঠিত করেন। মূলধনের অভাবে কয়েক বৎসর এই নবপ্রতিষ্ঠিত কারখানাটি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল—তজ্জন্য, প্রচলিত বহুমূল্য যন্ত্রাদির পরিবর্ত্তে প্রফুল্লচন্দ্র স্বল্পমূল্যের এবং স্বপ্রস্তুত সরল যন্ত্রাবলীর সাহায্যে কার্য্য চালাইয়াছেন। ডাক্তার রায়ের পরিশ্রম ও সাধুতার ফল ফলিয়াছে—তৎপ্রতিষ্ঠিত ঔষধের কারখানাটি এমন লাভজনক হইয়াছে—আর উহার স্থায়িত্ব সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ইউরোপ মহাদেশের সুধীগণকর্ত্তৃক প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভা বিশেষ সম্মানিত হইয়াছে। একদা একজন ফরাসী রসায়নবিৎ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত রাসায়নিক পদার্থ সকলের প্রস্তুতপ্রণালী বিষয়ে প্রফুল্লচন্দ্রকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন—এই প্রশ্নের সমাধান হইতেই তাঁহার "হিন্দুরসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাস" নামক জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থের উৎপত্তি। এই গ্রন্থে হিন্দুগণের রসায়ন-বিদ্যায় অধিকার পুরাতত্ত্বের হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাছাড়া ভারতীয় বৃক্ষ ও খনিজ পদার্থ কত রসায়নকার্য্যে লাগিতে পারে এই গ্রন্থপাঠে তাহাও অবগত হওয়া যায়। এইগ্রন্থ প্রফুল্ল-চন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও গবেষণার কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ। ডাক্তার রায় আজিও অবিবাহিত—তিনি তাঁহার সমগ্র শক্তি দ্বারা নীরবে দেশের কল্যাণসাধন করিতেছেন। তাঁহার ব্যবহার বড় সরল এবং আহার বিহারে তিনি বড় পরিমিত। সদাশয়তা, সারল্য, দয়াশীলতা এবং নম্রতার গুণে প্রফুল্লচন্দ্র বন্ধুবর্গের ও ছাত্রসমূহের অত্যন্ত প্রীতিভাজন।



Kuntaline Press, Calcutta.

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সুবিখ্যাত, সুধী, সুলেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় ১৮৫৪ সালে বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। দেশীয় নেতৃবর্গের অন্যতম হইলেও বিদেশী ও স্বদেশী উভয় সমাজেই তিনি সমধিক সমাদৃত। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ভগবতীচরণ ঘোষ মহাশয় তৎকালে বগুড়ার নবপ্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৫ বৎসর বয়সে নগেন্দ্রনাথ উচ্চতম বৃত্তিলাভ করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে উচ্চতম বৃত্তি সহকারে এফ, এ, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন। বি, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া পরীক্ষার কয়েকমাস পূর্ব্বেই উচ্চতর শিক্ষার আকাঙ্ক্ষায় তিনি বিলাত যাত্রা করেন এবং লণ্ডনের University কলেজে প্রবেশ করেন। ইংলণ্ডে গিয়া তাঁহার পাঠের প্রবৃত্তি আরো চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু তিনি তথায় কোন বিশেষ উপাধি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত না হইয়া নিজের মনোমত বিষয় সকল অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কিছুকাল তিনি কেম্ব্রিজের Christ কলেজেও অধ্যয়ন করিতে ছাড়েন নাই। ইংরাজি সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে বিলক্ষণ শিক্ষা লাভ করিয়া অবশেষে তিনি ব্যারিষ্টারি পাশ করেন এবং ১৮৭৫ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রাকটিস্ আরম্ভ করিলেন। বাল্যকাল হইতেই নগেন্দ্রনাথের ইংরাজি রচনায় প্রতিভা ছিল। এফ, এ, পরীক্ষার পর হইতেই তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন এবং Indian Post নামক দৈনিক পত্রে তাঁহার সুলিখিত প্রবন্ধসকল প্রকাশিত হইতে থাকে। উক্ত পত্রের ইংরাজ বাঙ্গালী সকল পাঠকই ১৭ বৎসরের বালকের অপূর্ব্ব ইংরাজী রচনায় বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা নগেন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি Indian Views of England নামে এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রচনা করেন। ঐ প্রবন্ধ তৎকালীন সাহিত্য সভায় পঠিত এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই অবধি ইংরাজি রচনায় তাঁহার প্রতিপত্তি আরো বাড়িয়া উঠিল এবং চারিদিক হইতে লোকে তাঁহার নিকট হইতে, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও আইন বিষয়ক নানাপ্রকার প্রবন্ধ লিখাইয়া লইতে আসিত। তৎকালে তাঁহাকে অনেক কাগজেই লেখা যোগাইতে হইত। ১৮৮৩ সালের আগষ্ট মাসে তিনি স্বনাম খ্যাত সুপ্রসিদ্ধ Indian Nation পত্রিকা পরিচালন আরম্ভ করেন। ঐ পত্রিকা এখনও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও শ্লাঘার বিষয়। পৃথিবীর যে কোন শিক্ষিত দেশেই হোক্ উক্ত Nationএর মত পত্রিকায় সমাদর ও সুখ্যাতি অবশ্যম্ভাবী। উহার প্রত্যেক ছত্রে অপূর্ব্ব সততা ও সৎসাহসের পরিচয় প্রকাশ পায় এবং রচনাভঙ্গী ও লিপি নৈপুণ্য যে কোন উচ্চতম লণ্ডণ পত্রিকার ও গৌরবের স্থল। এই পত্রিকা ছোটলাট Alex. Mackenzieর মত বহুতর মান্যগণ্য ব্যক্তির ভূয়সী প্রশংসালাভ করিয়াছে। সবে যখন ৩।৪ বৎসর practice করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাকে স্বনাম খ্যাত মহাপণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

অনুরোধে তৎপ্রতিষ্ঠিত Metropolitan কলেজের অধ্যাপনার কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইল। ঐ প্রকার গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন বটে কিন্তু ঐ সঙ্গে তাঁহার ব্যবসায়ের উন্নতির আশা তিরোহিত হইল। Municipal কমিশনার পদের জন্যও তাঁহাকে অনেক পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করিতে হইল ইহার পরে আবার তাঁহার উপর Pres. Magistrateship ও Calcutta Universityর সদস্য পদ অর্পিত হওয়াতে, তাঁহার নিজের আইন ব্যবসায় পরিচালনা দুর্ঘট হইয়া উঠিল। এইরূপ অখণ্ড মনোযোগের অভাবে তাঁহাকে আর্থিক হিসাবে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। তাহার পরেও যে টুকু সময় নিজ কার্য্যের জন্য অবশিষ্ট থাকে তাহাও নানাসমিতির কার্য্য এবং বক্তৃতা, প্রবন্ধ লিখন, দরখাস্ত, address এই প্রকার সাধারণের কার্য্যে অতিবাহিত হইয়া যায় সুতরাং ঐ হিসাবে দেখিতে গেলে তাঁহার ত্যাগ স্বীকার অল্প নহে। Kristo Das Pal, A study ও Maharaja Nunda Kumar নামে যে দুইখানি ইংরাজী পুস্তক রচনাকরিয়াছেন তাহাতে ও তাঁহার পরিচালিত Nation এর Critical রচনায় তাঁহার কি যশ কি ইংরাজ ও দেশীয়, উভয় সমাজেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ইংরাজি রচনায় যে কোন ইংরাজ শ্রেষ্ঠ লেখকের গৌরবের বিষয়। তাঁহার অপক্ষপাত অভিমত, সুদৃঢ় কর্ত্তব্যানুরাগ, অকুণ্ঠ সমালোচনারীতি, অক্ষুণ্ণ তেজস্বিতা, আত্মপ্রকাশের সৎসাহস বাস্তবিকই দুর্লভ। তাঁহার ইংরাজি রচনার খ্যাতি ইংলণ্ডেও পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে এবং সেখান হইতে তিনি R. S. L. উপাধি পাইয়াছেন বাঙ্গালার পক্ষে উহা অল্প শ্লাঘার কথা নহে। তিনি বি, এ, প্রভৃতি উচ্চতম পরীক্ষায় পরীক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুধাবন, সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। মেদিনীপুরের প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতিত্বে বরণ প্রভৃতি ব্যাপার, তাঁহার প্রতি দেশীয় লোকের আন্তরিক শ্রদ্ধার প্রমাণ প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালা ব্যক্তি নিজ ব্যবসায়ে অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারিলে, এত দিনে যে বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করিতেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তিনি পরোপকারী, সদালাপী এবং ইংরাজীতে মহাপণ্ডিত এবং বিলাত প্রত্যাগত হইলেও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত।



শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু বিক্রমপুরের একটি প্রাচীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কেম্ব্রিজের বি, এ, ও লণ্ডনের বি, এস, সি, পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। তদবধি প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানধ্যাপক নিযুক্ত আছেন। ডাক্তার বসু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের যান্ত্রিক প্রমাণ প্রদর্শনে চিরকাল বিলক্ষণ নিপুণ-হস্ত ছিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রবর্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন ডাক্তার বসুর চিরদিনের ইচ্ছা—এই জন্য তিনি পূর্ব্বে স্বীয় ছাত্রগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের সহিত সদালাপ, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ প্রভৃতি করিতে ভাল বাসিতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থ বিদ্যা বিষয়ক যন্ত্রাগার ডাক্তার বসুর যত্নে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে। ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশীয় বরগণ এসিয়াটিক সোসাইটির গৃহে "On the Polarisation of the Electricity" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাড়িততত্ত্বজ্ঞ লর্ড কেলভিন ডাক্তার বসুর প্রবন্ধের মৌলিকতায় বিস্মিত হন। লণ্ডনের টাইম্‌স পত্র বসুমহাশয়ের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলেন যে তাঁহাকে যন্ত্রাদিও স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় সন্দর্ভ লর্ড রেলী কর্ত্তৃক রয়াল সোশাইটিতে প্রেরিত হয়—এই সন্দর্ভের বিষয় ছিল—"The determination of the Indices of refraction for the Electrical Ray" রয়াল সোশাইটি বসু মহাশয়ের কার্য্য সৌকর্য্যার্থ তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করেন। তদনন্তর অধ্যাপক বসু বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত গবেষণা ফণ্ডের অধ্যক্ষ হন। কিছু কাল পরে ইউরোপে বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য তিনি ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তিক মাননীত হইয়া সস্ত্রীক বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতে অবস্থান কালে তিনি ব্রিটিস এসোসিয়েসনের একটি অধিবেশনে "তাড়িত কম্পনের গুণাবলি নির্ণয়ার্থ একটি পূর্ণাঙ্গ যন্ত্র" এই প্রবন্ধ পাঠ ও স্বীয় যন্ত্র ব্যবহার করেন। তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধ "The Electric conductivity exhibited by certain polarising substances" রয়াল সোশাইটির সমক্ষে পঠিত হয়। এই সময় গ্লাসগো নগরে লর্ড কেলভিন তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা করেন। তিনি Society of Arts নামক সমিতির এক অধিবেশনে ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধে ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন ও বিজ্ঞানের উচ্চতর বিষয়ালোচনার নিমিত্ত বৃত্তি স্থাপন ও সরকারি নানা বিভাগে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নিয়োগ বিষয়ক প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবগুলি বিলাতের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে সমর্থিত হয়। বিলাতের সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ ভারতসচিবের নিকট ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপনের জন্য আবেদন করেন। জর্ম্মাণীতে ও ফ্রান্সে তিনি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বৈজ্ঞানিক সমিতিতে বক্তৃতা করেন। ফরাসিদেশে ও আমেরিকাতে ডাক্তার বসুর যন্ত্রের ব্যবহার হইতেছে। তাঁহার যন্ত্র হয়ত কালে দূরে সংবাদ প্রেরণ কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে। ডাক্তার বসুর মত বৈজ্ঞানিক

পণ্ডিত এদেশে আর একজনও নাই। তিনি সরল ও অমায়িক লোক। ছাত্রদিগকে সর্ব্বদা স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আশা করি তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া মাতৃভূমির অশেষ কল্যাণ সাধন করিবেন।



শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রায় ৫৯ বৎসর হইল, উচ্চ কুলীন বংশে, পিতার কর্ম্মস্থান জব্বলপুর নগরে কালী-চরণের জন্ম হয়। শৈশবে কিছুকাল জব্বলপুরে অতিবাহিত করেন। তদনন্তর কলিকাতায় থাকিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺ হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি হুগলী নিবাসী ছিলেন। পিতামাতা উভয়েই ভক্ত শাক্ত ছিলেন। কিন্তু কালীচরণের মধ্যে তাঁহারা এমন কিছু লক্ষ্য করিয়া ছিলেন যে, তাঁহাকে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এবং অসাধারণ দায়িত্ব জ্ঞানের সহিত ইহাঁর প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতেন। পিতার আদেশ ছিল যে কেহ ইহাঁর গায়ে হাত তুলিবে না। শিশু কালীচরণও এত বাধ্য ছিলেন যে কখনও তাঁহার গায়ে হাত দিবার কোনও কারণ উপস্থিত হয় নাই। তাঁহার বাধ্যতা অতি অসাধারণ প্রকৃতির। যখন তাঁহার বয়স ৭।৮ বৎসর মাত্র, তখন গৃহে কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, "যদি কখনও জলে পড়ে যাও তবে মাটি ধরে চুপ করে থেকো।" তাহার কিছুদিন পরে একদিন দেখা গেল কালীচরণ জলে পড়িয়া গিয়াছেন, তাঁহার কাপড় ভাসিতেছে, এবং তিনি মাটি ধরিয়া পড়িয়া আছেন। এমন বিপদে পড়িয়াও যে ছেলে গুরুজনের উপদেশ অনুসারে বাধ্য থাকিতে পারে সে সহজ ছেলে নয়। অতি শৈশবে কালীচরণের মধ্যে পারিবারিক ধর্ম্মভাব, এবং বিনয় বাধ্যতা শ্রদ্ধাভক্তি, ধৈর্য্য এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। তিনি অতি যত্ন ও মনোযোগের সহিত লেখা পড়া আরম্ভ করিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অসাধারণ স্মরণশক্তি এবং অধ্যবসায়ের গুণে তিনি চিরদিন বিদ্যালয়ে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁহাকে পুত্রবৎ ভালবাসিতেন। তিনি কামর সাহেবের বিশেষ প্রিয় ছাত্র ছিলেন। অতি অল্পবয়সেই তিনি বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথম এম্. এ.। গভীর জ্ঞান, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, ওজস্বী বক্তৃতা, অকৃত্রিম স্বদেশ প্রেম, সর্ব্বোপরি তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাব ও নির্ম্মল মধুর চরিত্র, তাঁহাকে দেশে বিদেশে, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে দেবতার ন্যায় পূজ্য করিয়া রাখিয়াছে। সকল প্রকার সৎকার্য্যে তাঁহার অনুরাগ, এবং দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের বিষয় চিন্তা করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। সংসারে তিনি অতি উচ্চপদ লাভ করিয়াছেন; একদিকে দেশবাসীর শ্রদ্ধা ভক্তি পাইয়াছেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে কতব্যাপারে নেতৃত্বে বৃত হইয়া দেশনায়কের স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, অপরদিকে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নানা সম্মান জনক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন,—তিনি একবার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, এবং একবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি হইয়াছেন অথচ তাঁহার ন্যায় বিনয়ী, অমায়িক ও নিরহঙ্কার লোক প্রায় দেখা যায় না। তিনি যৌবনে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন;

চিরদিন অটল নিষ্ঠা সাধনার দ্বারা সেই মহৎ চরিত্রের অনুসরণ করিয়াছেন। এমন সত্যানুরাগী, সদ্বিবেচক নির্ম্মল চরিত্র, মহাজ্ঞানী, কর্ম্মিষ্ঠ প্রকৃত সাধু পুরুষ দুই এক জনের বেশী দেখা যায় না। এই মহাত্মা এখনও আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। বহুদিন হইতে তিনি বার্দ্ধক্যে ও রোগে আর শ্রমসাধ্য কাজ করিতে পারেন না। তবুও মহাত্মা আনন্দ মোহন বসু মহাশয়ের পরলোক গমনের পর দ্বিতীয় ব্যক্তির অভাবে রুগ্ন কালীচরণকেই ভারতসভার সভাপতি করা হইয়াছে।



শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ জুন বিচারপতি ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ডাক্তার আশুতোষের পিতা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভবানীপুর অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত বলাগড় আশুতোষের পুরুষানুক্রমিক বাস গ্রাম। তাঁহার পিতা সপরিবারে ভবানীপুরেই বাস করিতেন। ডাক্তার আশুতোষের গৌরবপূর্ণ জীবনের কাহিনী উপন্যাসের ন্যায় বিচিত্র, বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে আশুতোষের নাম নানা কারণে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবার যোগ্য। আশুবাবুকে দেখাইয়া বাঙ্গালী জাতীয়তার অহঙ্কার করিতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই তিনি অতি তরুণ বয়সে অপূর্ব্ব গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হন; এবং ১৮৮৬ অব্দে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৮৮ অব্দে তিনি হাইকোর্টের উকীল হন, এবং ১৮৯৪ অব্দে ডি, এল পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া 'ডাক্তার' উপাধিতে ভূষিত হন। সমাজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, আইন সভায়, বিচারালয়ে সর্ব্বত্র আশুতোষের খ্যাতি, তাঁহার পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের পরিচায়ক। বিশ বৎসরের যুবক গণিতে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন; তাহাতে গণিতের পীঠস্থান ক্যাম্ব্রিজে পর্য্যন্ত বিস্ময় কোলাহল সমুত্থিত হইয়াছিল, শুভ্রতুষার কিরীট শ্বেত-দ্বীপের বিদ্বৎসমাজ একজন বাঙ্গালী যুবকের জ্ঞানের গভীরতা সন্দর্শন করিয়া প্রশংসার বিজয়দুন্দুভি ধ্বনিত করিয়াছিলেন; আশুতোষ ইউরোপে দেখাইয়াছেন—জননী বীণাপাণি বঙ্গমাতার ছিন্ন অঞ্চলে কি অমূল্য রত্ন দান করিয়াছেন! প্রতিভার জ্যোতি কখন অন্ধকারে আবৃত থাকে না। ডাক্তার আশুতোষের অসাধারণ আইনজ্ঞানে শিক্ষিত সমাজ মুগ্ধ হইলেন, তাঁহার পসার ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। কিন্তু তাঁহাকে দীর্ঘকাল ওকালতি করিবার জন্য ভগবান পৃথিবীতে পাঠান নাই; তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যেই তরুণ বয়সেই হাইকোর্টের বিচারপতিপদে উন্নীত হইলেন। এত অল্প বয়সে, এত অল্পদিন ওকালতি করিয়া এ পর্য্যন্ত কোন ভারতবাসী বিচারবিভাগের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আদালতে উপবেশন করিতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্ট যোগ্যপাত্রে যোগ্য সম্মান দান করিয়াছেন। কিন্তু কেবল বিচার কার্য্যেই ডাক্তার আশুতোষ তাঁহার অমূল্য সময় ব্যয় করেন না, দেশহিতেও তাঁহার লক্ষ্য আছে। কর্ত্তৃপুরুষেরা তাঁহার গুণ বুঝিয়াছিলেন; তাৎকালিন বড় লাট লর্ড ল্যান্সডাউন ডাক্তার আশুতোষকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরূপে মনোনীত করেন। সিণ্ডিকেটের সভ্যরূপে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক হিতকর অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করেন। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ডাক্তার আশুতোষের যেরূপ প্রভাব, কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর কোন দেশীয় সদস্যের তেমন প্রভাব নাই, ভারতে ইংরাজ রাজত্বের ইতিহাসে ইহা অভূতপূর্ব্ব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাক্তার আশুতোষ দুই

বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন; ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারী সদস্যেরা ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধি সদস্যপদে মনোনীত করেন। ব্যবস্থাপক সভায় তিনি যে চিন্তাশীলতা, বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা একদিন বিশ্বনিন্দুক পায়োনিয়ারেরও প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছিল। হাইকোর্টের বিচারপতি পদ গ্রহণ করায় তাঁহাকে ব্যবস্থাপকসভার সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে হয়। ডাক্তার আশুতোষ কয়েক বৎসর বিশেষ প্রশংসার সহিত বিচারপতির কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার পর ভারত গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য তাঁহাকে দীর্ঘকালের অবকাশ দান করেন। ভারতের বর্ত্তমান বড় লাট লর্ড মিণ্টো এই শান্ত প্রকৃতি, নিরীহ, পবিত্রচেতা ও কর্ত্তব্য কুশল ব্রাহ্মণের জ্ঞানের ও গুণের পরিচয় পাইয়া এমন মুগ্ধ হইয়াছেন যে, ভারতের রাজস্ব সচিবের পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার কথা উঠিয়াছে। বাঙ্গালী দূরের কথা কোন ভারতবাসী ইতিপূর্ব্বে এমন গৌরবজনক পদ লাভ করেন নাই। বস্তুতঃ ডাক্তার আশুতোষ যে বিষয়ে হাত দিয়াছেন—তাহাতেই অসাধারণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এমন পাণ্ডিত্য, এত মহত্ত্ব, অথচ এমন বিনয় ও নিরহঙ্কার একাধারে দুর্লভ; ডাক্তার আশুতোষের ন্যায় শ্রমশীল ও পাঠানুরাগী ব্যক্তি একালে আমাদের দেশে একান্ত বিরল। তিনি তাঁহার সংস্কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক "সরস্বতী" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। অথচ যে সময় তিনি এই বিদ্যা শিক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন—সে সময় পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করা অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য—অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। তাঁহার পাঠানুরাগের আর এক প্রমাণ তাঁহার পুস্তকালয়। গণিত বিদ্যা বিষয়ক এত দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য গ্রন্থ বঙ্গদেশের আর কোনও পুস্তকালয়ে নাই। ডাক্তার আশুতোষের পুস্তকালয় কলিকাতা রাজধানীর গৌরব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব এই পুস্তকালয়ের স্থাপন ও উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, তিনি তাহার প্রতিষ্ঠা ও গৌরব সম্পূর্ণ করিয়াছেন। এই পুস্তকালয় তাঁহার পিতার জ্ঞানোজ্জ্বল ও স্নেহমধুর স্মৃতিতে বিমণ্ডিত। এই পুস্তকালয়েই আশুতোষের বাল্যের স্বপ্ন ও যৌবনের তপস্যা সফল হইয়াছে। আশুতোষ কখন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন না, কিন্তু রাজকার্য্যের সহায়তায় নিঃশব্দে দেশের প্রকৃত হিতসাধনে কখন তিনি কুণ্ঠিত নহেন। পরোপকারে তাঁহার প্রবল অনুরাগ। তাঁহার মনের বল অসাধারণ, তাঁহার কর্ম্মশীলতা বাঙ্গালীমাত্রেরই অনুকরণীয়। ডাক্তার আশুতোষ এখন যৌবনের প্রান্তঃসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র, এখনও তাঁহার সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপূর্ব্ব মায়াচিত্রের ন্যায় প্রসারিত রহিয়াছে; আমরা আশা করি তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া তাঁহার অসামান্য প্রতিভার সম্মান রক্ষা করিবেন। যে কয়েকটি উজ্জ্বল নক্ষত্র আজ বঙ্গের আকাশ আলোকিত করিতেছে—তন্মধ্যে আশুতোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; অভাগিনী বঙ্গ জননী যেন দীর্ঘকাল তাঁহার এই কৃতি সন্তানের গৌরবে গৌরব অনুভব করিতে পারেন।